মহাকাশ



শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

আশুতোষ লাইব্রেরী
কলিকাতা - ঢাকা

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্ লিমিটেড্
স্বত্বাধিকারী: আশুতোষ লাইব্রেরী
৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
১/৮, জনসন রোড, ঢাকা

মুদ্রাকর
শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনারসিংহ প্রেস
৫, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

মূল্য দশ আনা

লোকান্তরিত

প্রাণাচার্য রমেশচন্দ্র ভিষগ্ভারতী

মেজ মামার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে



ঘরের দাওয়ায় বসে দেবু লেখাপড়া করছে। বাইরে আকা
উঠেছে পূর্ণিমার চাঁদ; তার রুপালি জ্যোচ্ছনায় সকল দিকে
গাছগাছড়া ঝলমল করছে।



খোকাটা ভারি দুষ্টু হয়েছে; তার চ্যাচামেচিতে এমন কি মাঝে মাঝে দেবুর লেখাপড়ায় একটু ব্যাঘাতই হচ্ছে। মা খোকাকে কোলে নিয়ে ঘরের সিঁড়ির পাশটিতে বসে শুরু করে দিলেন ছড়া কাটতে, 'আয় চাঁদা আয়—'

অমনি খোকা ঠাণ্ডা, নিজেই হাত তুলে 'আ আ তাঁ তাঁ' জুড়ে দিল।

মহাকাশ

চিরকাল ধরে চাঁদ-আসার মন্ত্র এদেশের মায়েদের মুখে মুখে। কিন্তু চাঁদ কোনদিন আসে নি, চাঁদ কোনদিন আসবেও না; চাঁদ-আসার আশা নিয়ে চিরকাল খোকারা ঘুমিয়ে পড়বে আর চাঁদের দেশের স্বপ্ন দেখবে।

দেবুর হাসি পেল। চাঁদ যে আসবার নয়—সেই মনের কথাটা সে শোনাবে কা'কে? তার বয়সটাকে এ বাড়িতে কেউই যে মান্যি করে না—মাঝে মাঝে এক ঠাকুরমা ছাড়া। দেবুর মাত্বরের কাছেই বসে ঠাকুরমা জপ করছিলেন। দেবু আড়চোখে চেয়ে দেখল, তাঁর জপ শেষ হয়ে গেছে। তাঁকে শুনিয়ে সে একটু হাসল। ঠাকুরমা বুঝলেন, কিছু-একটা মজা হয়েছে, সেটাই দেবু জানাতে চায়। বললেন, 'কি হল দাদু?'

আর একটু হেসে দেবু বলল, 'মায়ের কথায় হাসি পাচ্ছে। চাঁদকে ডাকছেন—আয় আয়! চাঁদ আসবে কি করে?'

ঠাকুরমা একটু এগিয়ে মাত্বরের কোণে বসলেন। সকল নাতির মতোই দেবুও ঠাকুরমাকে চিরদিনই ভালোবাসে; আজকাল তাঁকে যেন আরো বেশি করে ভালো লাগে, তার কারণ, দুনিয়ায় একটিমাত্র লোক ওই ঠাকুরমাই মানেন যে, দেবু একটা মস্তবড় লোক হয়ে উঠছে। তার অনর্গল বক্তৃতা শুনবার এমন মনোযোগী শ্রোতা আর নেই।

দেবু বলল, 'চাদের কি হাত-পা আছে? চাঁদ কি মানুষ

যে হেঁটে আসবে? চাঁদ কি পাখি যে উড়ে আসবে? বল দেখি ঠাক্‌মা, চাঁদটা কি?'

ঠাকুরমা বললেন, 'কি করে বলব দাতু, আমি মুখ্‌খু-শুখ্‌খু মানুষ। তুমি বলে দাও।'

ঠাকুরমার এই স্বীকারোক্তি দেবুর খুবই ভালো লাগে। গম্ভীরভাবে সে বলল, 'ওই আকাশে ওই-যে অত তারা ঝক্‌ঝক্ চক্‌চক্ করছে, বল দেখি ওগুলো কি?'

ঠাকুরমা বললেন, 'মানুষ মরে আকাশে গিয়ে তারা হয়ে ফুটে থাকে।'

দেবু খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল। ছেলেবেলা এঁদের গল্প শুনে তারও ধারণা ছিল, কথাটা বুঝি সত্যি। কি ভাগ্যি যে তার ভুল ভেঙে গেছে, দিনে দিনে আরো ভাঙছে। বলল, 'আচ্ছা বল দেখি এই যে পৃথিবী এই মাটির পৃথিবী যার ওপরে তুমি আমি বসে কথা বলছি, এই পৃথিবীটা চৌকো, না তিন-কোণ, না গোল---কিরকম?'

দেবু জানে ঠাকুরমা কি উত্তর দেবেন। তাই তাঁর দিকে আড়চোখে চেয়ে সে হাসতে লাগল। সে যা ভেবেছে, ঠাকুরমাও ঠিক তাই বললেন, 'পিত্থিমি তো চৌকো। তু'কোণে তুই কাছিম আর তু'কোণে তুটো হাতি, আর মাঝখানে রয়েছেন বাসুকিনাগ ফণা মেলে, এদের মাথার ওপর রয়েছেন পিত্থিমি।'

চাপা-হাসিতে দেবুর নাড়িভুঁড়ি মোচড় খেতে লাগল। সে

জানে, পৃথিবী সম্বন্ধে এধরনের আরো আজগুবি ধারণা বুড়োদের মনে আছে। পৃথিবী যে গোল এমন কথাও এঁদের কেউ কেউ দয়া করে বিশ্বাস করেন, তাঁদের মতে চারদিকে চারটে হাতির



পিঠে আছে সেই পিথিমি, আর সেই চারটে হাতি দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড এক কচ্ছপের পিঠের ওপর।

ঠাকুরমায়ের ওপর দেবুর করুণা হয়। কিচ্ছু জানেন না ব্যাচারি, কিচ্ছু না-জেনে-জেনেই বুড়ো হয়ে মরতে চললেন। ঠাকরমা ঠিকই বলেন, 'কদিন বাদে তো মরে যাব, দাদু, তার আগেই তুমি আমায় সব শিখিয়ে টিখিয়ে দাও, মরে গেলে তবু যমরাজকে বলতে পারব সে-সব।'

শেখাবে, যা জানে কিছুই ঠাকুমাকে শেখাতে সে বাকি রাখবে না ; তবে কথা হচ্ছে, তাঁর আয়ুতে কুলোলে হয়।

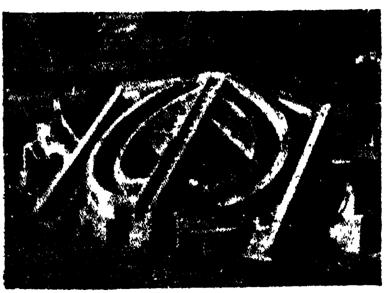
কিন্তু কেন এঁরা জানেন না? প্রাচীনকাল থেকেই তো পৃথিবীর কত বড় বড় পণ্ডিত পৃথিবীর সম্বন্ধে আর চন্দ্রসূর্য-গ্রহতারা সম্বন্ধে গবেষণা করে আসছেন। সেই হাজারো বছর আগে মুনিঋষিরা বেদে উপনিষদে 'ভূগোল' কথাটা যে লিখে গেছেন, 'ভূ' মানে পৃথিবী 'গোল' না হলে তাঁরা মিছিমিছি তা লিখতে যাবেন কেন? দেড়হাজার বছর আগে এদেশেরই পণ্ডিত আর্যভট্ট তো পৃথিবী সম্বন্ধে গবেষণা করে তা নিয়ে

কয়েকখানা বইই লিখে গেছেন তাঁর পরেও ভারতেরই পণ্ডিত ভাস্করাচার্যও এ সম্বন্ধে নিজের আবিষ্কারের কথা জানিয়ে গেছেন।



মহারাজ জয়সিংহ

অম্বরের রাজা মহারাজ জয়সিংহ চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রের সম্বন্ধে এক কথায় এবং জ্ঞানের কথায় বলতে গেলে "জ্যোতিষ"-শাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণার জন্য জয়পুরে, দিল্লীতে, উজ্জয়িনীতে, কাশীতে, মথুরায় যে-সব মানমন্দির তৈরি করিয়ে গেছেন, সে-সব তো এখনও আছে। (দেবু বড় হলে নিশ্চয়ই সে-সব দেখে আসবে)।—ঠাকুরমায়ের বয়স না হয় সত্তর হয়েছে—আশিই না হয় হয়েছে, তিনি কেন সে-সব কথা জানেন না ?



দিল্লীর একটি মানমন্দিরের ছবি

মহাকাশ

ঠাকুরমা বলেন, 'কি করব দাদু, আমি তো তোমার মতো ল্যাকাপড়া শিখি নি, কি করে জানব এতসব কথা ?'

সত্যি কথাই, লেখাপড়া না জানলে জ্ঞান না হলে এসব কথা জানবার তো উপায় নেই। বৃদ্ধা ঠাকুরমার জন্য দেবুর মনে রীতিমতো দয়া হয়।

খুব প্রাচীন পণ্ডিতেরা যদিও চন্দ্রসূর্য-গ্রহতারা সম্বন্ধে অনেক কথা জেনেছিলেন আর জেনেছিলেন যে পৃথিবী গোল, তবু তাদের ধারণা ছিল যে, পৃথিবীকে মাঝখানে রেখে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র সব তার চারদিকে ঘুরছে।



কোপারনিকাস

পঞ্চদশ শতাব্দীতে তার মানে এখন থেকে পাঁচশ বছর আগে ইউরোপে 'কোপারনিকাস্' ছিলেন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি বললেন যে, সূর্য আছে মাঝখানে আর তার চারদিকে গ্রহ-নক্ষত্র সব ঘুরছে। পৃথিবী একটা গ্রহ, কাজেই পৃথিবীও ওই সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।

দেবু জিজ্ঞাসা করল, 'দূরবীন কা'কে বলে জান, ঠাকুরমা ?'

ঠাকুরমা বললেন, 'আজকাল কতরকমের নতুন নতুন খাবার জিনিস বেরুচ্ছে, দাদু, আমরা কি তার নাম জানি ?'

দেবু একেবারে হো-হো করে হেসে উঠল, বলল, 'খাবার

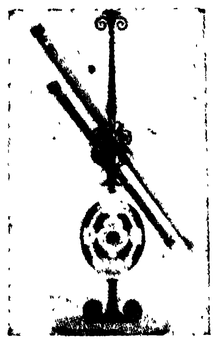
'জিনিস নয়, ঠাকুরমা, খাবার জিনিস নয়, দূরবীন হচ্ছে একটা চোঙের মতন যন্ত্র, তার ভেতর দিয়ে চেয়ে দেখলে খুব দূরের জিনিস একেবারে সামনে দেখতে পাওয়া যায়।'

ঠাকুরমা অবাক হয়ে গেলেন।

দেবু বলল, 'গ্যালিলিও ছিলেন পশ্চিম মহাদেশের এক মস্তবড় পণ্ডিতলোক, দূরবীন-যন্ত্র তিনিই আবিষ্কার করেন।



গ্যালিলিও



গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ

ভালো কথায় দূরবীনকে বলে দূরবীক্ষণ - মানে দূরের জিনিস দেখবার যন্ত্র। সেই যন্ত্র দিয়ে নানারকম পরীক্ষা করে তিনিও জানলেন যে, পৃথিবী আর অন্য সব গ্রহনক্ষত্র সূর্যকে ঘিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, - যেমন রোজ স্নান করে এসে তুমি তুলসীগাছকে প্রদক্ষিণ কর।'

পাছে তিনি ভুল বুঝে ফেলেন এইজন্য দেবু তাড়াতাড়ি

বলল, 'কিন্তু সূর্য থেকে কতখানি দূরে থেকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে জান? আমাদের বাড়ি থেকে স্টেশন এক মাইল দূরে—জান তো?'

ঠাকুরমা বললেন, 'তাই তো তোমরা বলে থাক, শুনতে পাই।'

দেবু বলল, 'সূর্য থেকে আমাদের এই পৃথিবী আছে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইলেরও বেশি দূরে।'

দূরত্বটা আন্দাজ করতে গিয়ে দন্তহীন মুখে ঠাকুরমা শুধু হাঁ করে রইলেন। সে-দৃশ্য দেখে দেবু তো হেসে খুন। সে বলল, 'আচ্ছা, সূর্য তো দেবতা, না?'

'দেবতা বই কি!' ঠাকুরমা বললেন, 'তা নইলে তার পুজো হয় কেন?'

'পুজো হয় লোকে পুজো করে বলে।' দেবু বলল, 'আমাদের মাস্টারমশাই বলেন, আশ্চর্য অথবা প্রকাণ্ড বা বিচিত্র কিংবা অদ্ভুত কিছু দেখলেই মানুষ তাকে ভক্তি করে—তা ভয়েই হোক আর ভালোবাসাতেই হোক। আসলে কিন্তু সূর্যটা হচ্ছে ভীষণ গরম প্রকাণ্ড-বড় একটা জ্বলন্ত গোল পিণ্ড, তার আলো আর তাপ এত বেশি যে, ওই কোটি কোটি মাইল দূর থেকেও তা আমাদের কাছে অনেক সময় অসহ্য মনে হয়। সূর্য কিরকম গরম জান? একটা খুব শুকনো খুব সরু খড় জ্বলন্ত আগুনে ধরবামাত্রই সেটা পুড়ে কুঁক্‌ড়ে যায়, তেমনি একটা হাতিকে

যদি সূর্যের আগুনে ধরা যায় সেটা তার চেয়েও ঢের কম সময়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।'

দেবুর কথা শুনে ঠাকরমার বিস্ময়ের আর অবধি রইল না।

দেবু খুব উৎসাহ পেয়ে গেল, বলল, 'আকাশে কিন্তু সূর্যের মতো, এমন কি সূর্যের চেয়েও বড় উজ্জ্বল আগুনের গোলা আরো অনেক আছে।'

ঠাকুরমা বললেন, 'সে-সব আমরা দেখতে পাই না কেন? আমরা তো ওই একটাই দেখি।'

'তার কারণ,' দেবু বলল, 'সূর্য আর তার ওই সব দাদা-ভায়াদের মধ্যে সূর্যই আমাদের সব চেয়ে কাছে-- '

'কাছে কি বলছ, দাদু' ঠাকুরমা চোখ গোল করে বললেন, 'এই যে বললে, ন'কোটি কত মাইল-- '

দেবু বলল, 'অর্থাৎ আর সব আগুনে-দেবতারা এত বেশি-কোটি মাইল দূরে রয়েছেন যে তাঁদের অনেককে এখান থেকে আমরা চোখেই দেখতে পাইনে, আর কাউকে কাউকে রাতের বেলা নক্ষত্রের মতো ছোট্ট দেখতে পাই।'

দেবুর এসব বিদ্যের কথায় ঠাকুরমার মুখ খুশিতে ভরে ওঠে।

দেবু বলল, 'আচ্ছা, ঠাক্‌মা, খু-উ-ব অন্ধকার রাতে দেখেছ আকাশের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত লম্বা একটা আবছা উজ্জ্বল চওড়া পথের মতো, তাতে রাশি রাশি ফুটকি-ফুটকি তারা গায়ে গায়ে জড়িয়ে আছে?'

'দেখেছি বই কি।' ঠাকুরমা স্বীকার করলেন, 'কতবার দেখেছি।'

'সেটাকে বলে ছায়াপথ।' দেবু বলল, 'যে নক্ষত্রগুলোকে মনে হয় গায়ে গায়ে জড়িয়ে আছে, তার একটা থেকে আর একটা লাখো লাখো মাইল দূরে। এখান থেকে খুব দূরে আছে বলে ওগুলোকে অত ছোট আর অমন কাছাকাছি বলে মনে হয়।'

ঠাকুরমা আকাশের দিকে চেয়ে বললেন, 'সেই ছায়াপথ আজ দেখতে পাচ্ছিনে তো!'

দেবু বলল, 'খুব দূরে বলে, তার এক-একটা নক্ষত্রের আলো এখান থেকে মোটে একটা আলপিনের মাথার মতো চক্‌চকে দেখায়। জোছনা-রাতের চাঁদের আলোতে সে-আলো হার মেনে যায়, তাই আজ ছায়াপথ দেখতে পাচ্ছিনে।'

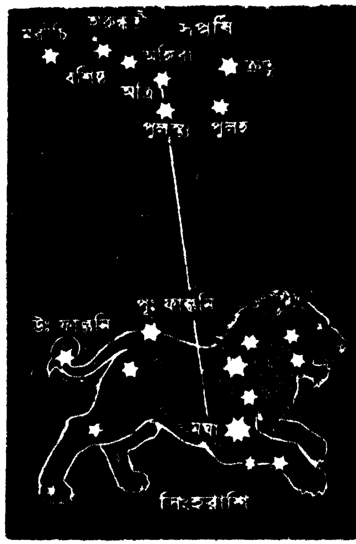
আলো-ঝলমল আকাশের দিকে দেবু অনেকক্ষণ চেয়ে রইল, তারপর বলল, 'আচ্ছা ঠাকুমা, আমার তো সিংহরাশি?'

ঠাকুরমা পুলকিতভাবে বললেন, 'ও মা, সে খবরও তুমি রাখ?'

'রাখিনে?' বিজ্ঞভাবে হাসিমুখে দেবু বলল, 'চৈত্রসংক্রান্তির দিনে জ্যোতিষীঠাকুর যে বর্ষফল শোনাতে আসেন তাঁর মুখে শুনে আমি সক্কলের রাশিনক্ষত্র মনে রেখেছি। আমার সিংহ-রাশি বলেই না তুমি আমায় এক এক সময় পশুরাজ বলে ডাক।'

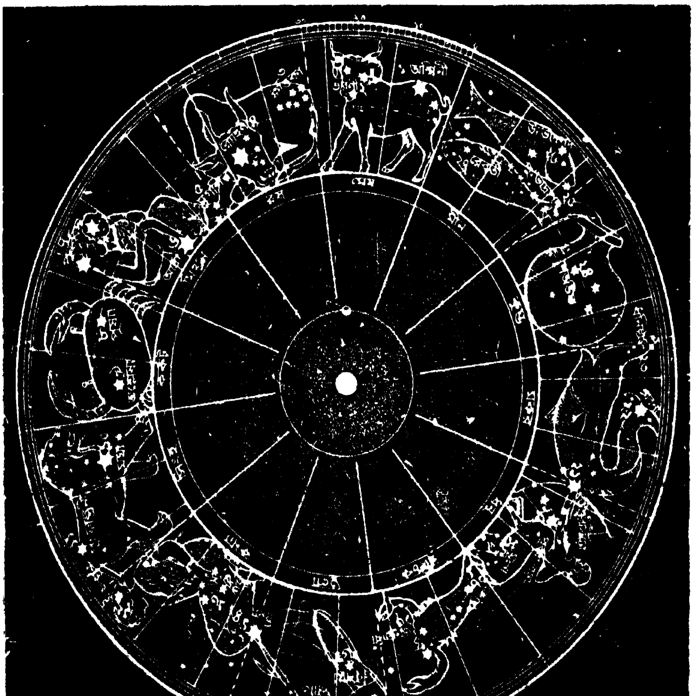
ঠাকুরমা হাসতে লাগলেন।

দেবু বলল, 'রাশি কা'কে বলে জান? জান না। রাশি-কথাটার মানে হচ্ছে সমূহ—মানে একসঙ্গে কতকগুলো। আকাশে কতগুলো নক্ষত্রের সার আছে, এক-একটা সারে নক্ষত্রগুলো এমনভাবে সাজানো যে, একটা থেকে আর-একটা, তার থেকে আর-একটা পর্যন্ত লাইন টেনে টেনে গেলে একটা ছবি হয়ে দাঁড়ায়। এমনি করে, এমন কতকগুলো নক্ষত্র এক জায়গায় সাজানো আছে যেগুলোর একটা থেকে আর-একটা পর্যন্ত লাইন টেনে টেনে গেলে মোটামুটি একটা সিংহের ছবি হয়ে দাঁড়ায়, সেই নক্ষত্রের রাশকে একসঙ্গে বলা হয় সিংহ-রাশি।'



ঠাকুরমা এতক্ষণে দেবুকে একটা প্রশ্ন করতে পারলেন, কেন-না রাশি কয়টা তা তাঁর জানা আছে। বললেন, 'বল দেখি, ক'টা রাশি আছে?'

দেবু কি হটবার পাত্র? বলল, 'রাশি বারোটা---মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন।'



ঠাকুরমা অবাক হয়ে গেলেন এক নিশ্বাসে অতগুলো বলে দেবু একটু হাঁপিয়ে পড়ল।

সে বলল, 'এ ছাড়া সাতাশটে নক্ষত্রও আছে—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিনী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী। আমার তো মঘা-নক্ষত্র।'

ঠাকুরমা আরো অবাক হয়ে গেলেন। দেবু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, 'এর কতকগুলো আছে তার এক-একটি নামে একটিমাত্র নক্ষত্র; আবার কতগুলো আছে, কয়েকটি নক্ষত্র মিলে একটি নক্ষত্রের নাম, —সেগুলোকে রাশি না বলে কেন যে নক্ষত্র বলা হয় কে জানে? বোধহয় কতগুলো নক্ষত্র এমনভাবে জড়াজড়ি করে আছে যে দূর থেকে তাকে বড় একটা নক্ষত্রের মতো মনে হয়; আর তার একটা থেকে আর একটা পর্যন্ত লাইন টানলে দেখতে কোনো ছবির মতো হয় না, তাই সেগুলোকেও রাশি না বলে নক্ষত্রই বলা হয়।'

ঠাকুরমা বললেন, 'একবার যে তোমাদের কি-এক বইতে একটা ফুট্‌কির ধাঁধা দেখিয়েছিলে, এক ফুট্‌কি থেকে আর-এক ফুট্‌কি অবধি পেনসিল টেনে গেলে একটা ছবি হয়ে গেল, রাশি বুঝি তেমনি?'

দেবু বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক তেমনি। রাশিগুলোর নক্ষত্র থেকে নক্ষত্র পর্যন্ত রেখা টেনে গেলে আজকাল আর ঠিক ঠিক ছবি হয়ে দাঁড়ায় না। সেই অতীতকালে, যখন পণ্ডিতেরা এসব রাশির নাম

দিয়েছিলেন, সে সময় নক্ষত্রগুলো যেমন যেমন সাজানো ছিল, এতকাল পরে তার অনেক নক্ষত্রেরই ঠাঁই নড়ে গেছে, অনেক নক্ষত্র লোপ পেয়ে গেছে, কিন্তু নামগুলো সে রকমই চলে আসছে।

দেবু জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, বলতে পার, ঠাক্‌মা, এসব রাশি-নক্ষত্র আছে কোথায় ?'

ঠাকুরমা চট্‌ করে উত্তর দিলেন, 'আকাশে আছে আর কি !'

দেবু বলল, 'আকাশে কি যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে ?'

ঠাকুরমা উত্তর দিতে পারলেন না। দেবুই বলল, 'এমনি দেখে তো মনে হয়, সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, তাই না ? সেই মনে করা, গোলাকার পথেই রাশিনক্ষত্রগুলো সাজানো রয়েছে। তাই একে বলা হয় রাশিচক্র অর্থাৎ রাশির চাকা আর কি !'

ঠাকুরমা বললেন, 'আকাশে এত মজার কাণ্ড-সব হচ্ছে !'

'মজা বলে মজা !' দেবু বলল, 'তুমি মনে করছ, ব্যাচারা পৃথিবীই বুঝি সূর্যের চারদিকে ঘুরে ঘুরে হয়রান হচ্ছে ? শুধু কিন্তু পৃথিবী নয়,— গ্রহ কা'কে বলে জান ?'

ঠাকুরমা বললেন, 'তুমিই বল।'

দেবু তো বলবেই, ঠাকুরমা জানেন না যখন, তাঁকে জানিয়ে দিতে হবে না ? সে বলল, 'পৃথিবীর মতো যেগুলো সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়ায় সেগুলোর নাম গ্রহ। পৃথিবীও একটা গ্রহ।'

ঠাকুরমা প্রশ্ন করলেন, 'আরো যে-সব গেরহো সুয্যের চারদিকে ঘুরছে সেগুলোর নাম কি?'

'গেরহো নয়, শুদ্ধ করে বলবে গ্রহ।' দেবু বলল, 'সেগুলো হচ্ছে—বুধ, মঙ্গল, শুক্র, বৃহস্পতি, শনি—'

ঠাকুরমা বললেন 'এ যে সব বার-এর নাম বলছ, দাতু!'

'হ্যাঁ, এ পাঁচটা গ্রহের নামে আছে পাঁচটা বার, রবিবার হল সূর্যের নামে, আর সোম মানে চন্দ্র জান তো? সোমবারটা হল চন্দ্রের নামে। চন্দ্র কিন্তু গ্রহ নয়।'

'তবে কি?'

'চন্দ্র হচ্ছে উপগ্রহ।' দেবু বলল, 'গ্রহের চারদিকে যারা ঘুরে বেড়ায়, তাদের বলা হয় উপগ্রহ। চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ।'

ঠাকুরমা বললেন, 'সব গ্রেহেরই চারদিকে ঘুরে মরবার জন্যে একটা করে আবার উপগ্গেরো আছে বুঝি?'

'নাঃ।' দেবু বলল, 'কতগুলো গ্রহ আছে, তাদের একটাও উপগ্রহ নেই, আবার কতগুলো রয়েছে তাদের এক-একটা গ্রহের একটার চেয়ে বেশি উপগ্রহ আছে। মঙ্গলগ্রহের উপগ্রহ আছে তুটো; ইউরেনাস নামে একটা গ্রহ আছে, তার চারটে উপগ্রহ।'

ঠাকুরমা বললেন, 'বাব্বাঃ!'

'চারটেতেই বাব্বাঃ হয়ে গেল!' দেবু বলল, 'বৃহস্পতির উপগ্রহ ন'টা, শনিরও ন'টা, নেপচুন বলে একটা গ্রহ আছে সেটার—'

ঠাকুরমা বললেন, 'সেটার বুঝি কুড়িটা ?'

'উহুঃ।' দেবু হেসে বলল, 'সে ব্যাচারির মোটে একটা উপগ্রহ—পৃথিবীর মতো।'

ঠাকুরমা বললেন, 'চন্দ্র যে পৃথিবীকে আলো করে, ওটা তো তাহলে বিরাট একটা আলো ?'

দেবু বলল, 'চন্দ্রের নিজের কিন্তু আলো বিলোবার কোনো ক্ষমতাই নেই। সূর্যের আলো চাঁদের ওপর পড়ে, সে আলো ঠিক্‌রে আবার পৃথিবীতে আসে। শুধু চন্দ্র কেন, কোনো গ্রহ-উপগ্রহের নিজের কোনো আলো নেই, সকলেরই আলো সূর্যের কাছে ধার করা।'

ঠাকুরমা বললেন, 'তা হলে সুয্যি-মহারাজ বুঝি মাঝখানে রয়েছেন আর তাঁকে ঘিরে গেরহো-উপগ্‌গেরোগুলো ঘুরে ঘুরে মরছে।'

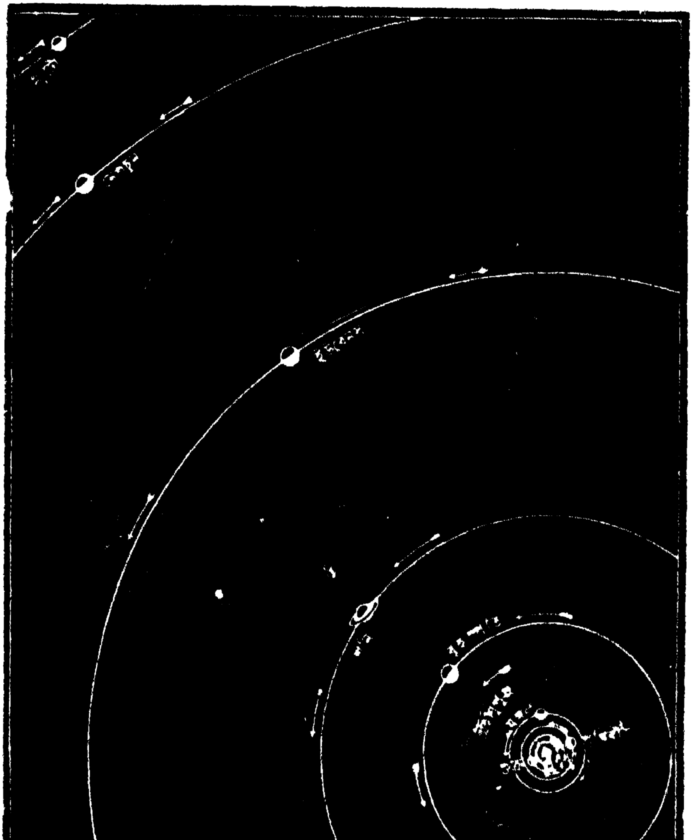
'হুঁ', দেবু বলল, 'গ্রহ-উপগ্রহ-প্রজাদের নিয়ে সূর্যমহারাজের যে রাজ্য, তার নাম হচ্ছে সৌরজগৎ মানে সূর্যের দুনিয়া।'

ঠাকুরমা আর বেশি বিদ্যা গ্রহণ করতে সেদিন চাইলেন না, বললেন, 'অনেক রাত হয়েছে, দাদু, আজ তুমি খেতে যাও।'

দেবু হেসে বলল, 'তার মানে, তোমার ঘুম পাচ্ছে বুঝি ?'

*

পরের দিন কিসের একটা ছুটি। দুপুরবেলা ঘরের ভেতর একমনে বসে দেবু তার বাড়িতে অঙ্ক কর্‌বার শ্লেটে সুতো আর



সৌরজগৎ

মহাকাশ

পেনসিল দিয়ে ঘস্‌-ঘস্‌ করে গোল গোল রেখা কেটে ঠাকুরমাকে বিদ্যাদানের তোড়জোড় করছিল। ঠাকুরমাকে আগেই নিমন্ত্রণ করে রাখা হয়েছে। তিনি যথাসময়ে উপস্থিত হলেন। আদুরে নাতিটিকে নিয়ে এই ছাত্রী-মাস্টারের খেলা খেলতে তাঁর বড়ই আনন্দ।

ঠাকুরমা কাছে বসে বললেন, 'কি আঁকছ, দাদু ?'

স্লেট সরিয়ে রেখে দেবু মাস্টারি ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল, 'সূর্যের চারদিকে যে-সব গ্রহ ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেগুলোর নাম কি বল দেখি।'

প্রথম প্রশ্নেই ঠাকুরমা না-জবাব হয়ে রইলেন। দেবু বলল, 'কাল রাত্রে বললাম, আর আজই সব ভুলে গেছ ?···যাক্‌গে, আবার বলে দিচ্ছি, শোন বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস্‌, নেপচুন আর প্লুটো, এই নয়টা গ্রহ আকাশে সূর্যকে মাঝখানে রেখে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

ঠাকুরমা বললেন, 'তাদের গায়ে গায়ে ঠোকাঠুকি হয়ে যায় না ?'

'ঠোকাঠুকি লাগবে কি করে ?' দেবু বলল, 'প্রত্যেক গ্রহের যে ঘুরবার পথ আলাদা আলাদা।'

ঠাকুরমা বললেন, 'ও, আকাশে আবার ওদের জন্যে পথ আছে বুঝি ?'

'আকাশ তো শূন্য ফাঁকা, তাতে আবার পথ থাকবে কি ?'

বলে দেবু সুতোর ডগায় বাঁধা পেনসিলটা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, সুতোর মাথাটা ধরে পেনসিলটা সে নিজের চারদিকে বন্‌বন্ করে ঘোরাতে লাগল। দেবুর চারদিকে শূন্যে গোলাকার একটা কালো রেখা কেটে পেনসিলটা সুতোর মাথায় করে ঘুরতে লাগল। দেবু বলল, 'দেখ, ঠাকুমা, দেখ, পেনসিলটা আমার চারদিকে সমান দূরে থেকে একটা গোল পথ ধরে ঘুরছে তো?'

ঠাকুরমা স্বীকার করলেন যে, হ্যাঁ ঘুরছে। দেবু বলল, 'মনে কর আমি সূর্য, আর এই পেনসিলটা পৃথিবী; আমার চারদিকে পেনসিলটা ঘুরবার সময় যে রেখাটা দেখতে পেয়েছিলে সেই হল ওর ঘুরবার পথ। সত্যি সত্যি তো আর পথ নয়।'

'তা তো নয়ই।' ঠাকুরমা বললেন।

দেবু বলল, 'গ্রহও এমনি করে যে লাইন ধরে ঘুরছে, তাকে তার ঘুরবার পথ বলে ধরে নেওয়া হয় আর কি!'

দেখা গেল, ঠাকুরমা কথাটা ঠিক বুঝেছেন। তখন দেবু বলল, 'এক-একটা গ্রহ অন্যটা থেকে অনেক দূরে থেকে ঘুরছে, তাই ঠোকাঠুকি লেগে যায় না।'

ঠাকুরমা বললেন, 'আচ্ছা, দাদু, তুমি তো সুতো দিয়ে বেঁধে পেনসিলটা তোমার চারদিকে ঘোরালে, সূর্যের সঙ্গে কি গ্রহগুলো সব মোটা মোটা শিকল দিয়ে বাঁধা আছে?'

দেবু হেসে বলল, 'শিকল দূরে থাক্, সরু একগাছা সুতো দিয়েও বাঁধা নেই।'

মহাকাশ

ঠাকুরমা বড় বড় চোখ করে বললেন, 'তা হলে কি করে গ্রহ সমান দূরে থেকে সূর্যিকে প্রদক্ষিণ করছে? পড়ে যায় না?'

'ভালো কথা জিজ্ঞেস করেছ ঠাকুমা।' দেবু বলল, 'কোনো জিনিসকে নিজের দিকে টেনে রাখবার ক্ষমতা প্রত্যেক গ্রহেরই আছে, সূর্যেরও আছে। প্রত্যেকে নিজের জোরে প্রত্যেককে টেনে রাখছে, তাই ওরা কখনও পড়েও যায় না, আর, সব সময় নিজের নিজের পথেও থাকে সেইজন্যে।'

একটু থেমে দেবু বলল, 'পৃথিবী মঙ্গল এসব তো গ্রহ, চন্দ্রটা কি তা মনে আছে?'

ঠাকুরমা উত্তর দিলেন, 'উপগ্গেরো।'

দেবু খুশি হল, হেসে বলল, 'উপগ্গেরো কি? ভালো করে বলবে উপগ্রহ। উপগ্রহদের ঘোরায় কিন্তু বেশ একটা মজা আছে। ধর চন্দ্রের কথা। চন্দ্র তো পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, আবার পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারদিকে, তাতে করে চন্দ্রও সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। চন্দ্রের রথ-দেখা আর কলা-বেচা একসঙ্গে হয়ে যাচ্ছে।'

ঠাকুরমা হাসলেন। দেবু বলল, 'সূর্য থেকে আমাদের পৃথিবী কত দূরে থেকে ঘুরছে তা তো তোমায় বলেছি নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইলেরও বেশি। পৃথিবীটা কত বড় জান?'

ঠাকুরমা তা জানেন না।

দেব বলল, 'পৃথিবী তো গোল। তাই আমাদের এই বাড়ি

থেকে যে-কোনো দিকে যদি সোজা চলতে শুরু করে দিই, তাহলে ফের আমরা এখানেই এসে পৌছোব। এমনি করে এখান থেকে চলে আবার এখানে পৌছোতে আমাদের হাঁটতে হবে পঁচিশ হাজার মাইল। চলবে নাকি ঠাক্‌মা?'

ঠাকুরমা হেসে বললেন, 'বাব্বাঃ, ইস্টেশান থেকে বাড়ি অবধি এই এক মাইল হাঁটতে হলেই আমার বলে পেরান বেরিয়ে যাবার জো হয়!'

দেবু বলল, 'পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় যদি একটা লোহার শলা দিয়ে ফুঁড়ে সোজা ওপিঠে চালিয়ে দেওয়া যায়, তাতে কতখানি লম্বা শলা দরকার জান? সাতহাজার নয়শো ছাব্বিশ মাইল লম্বা একটা শলা হলে তবে তা দিয়ে পৃথিবীকে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করা যায়।'

হাজার হাজার মাইলের ব্যাপার সম্বন্ধে ধারণা করবার চেষ্টা করতে গিয়ে ঠাকুরমা যখন হাঁ করে আছেন তখন দেবু তাঁকে আরো হাঁ করিয়ে দিল, বলল, 'চন্দ্র কত দূরে থেকে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে জান? চন্দ্র আছে পৃথিবী থেকে দু-লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে।'

তাঁকে কতক্ষণ অবাক হয়ে থাকার সুযোগ দিয়ে দেবু তাঁর দিকে বড় বড় চোখের স্থির উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল। তারপর বলল, 'গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে সূর্যদেবের এই যে বিরাট সৌরজগৎ, তাই বা কতটুকু?'

ঠাকুরমা বললেন, 'কতটুকু কি বল, দাদু?'

'হ্যাঁ, ঠাক্‌মা, কতটুকুই বটে।' দেবু বলল, 'কথায় কথায় আমরা তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বলে ফেলি। এত বড় সৌরজগৎটা



বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক ক্ষুদ্র অংশের তুলনায় পৃথিবী

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক কোণে পড়ে আছে। সেই সৌরজগতের তুলনায় পৃথিবী তো আবার এক ফোঁটা একটা গ্রহ মাত্র। একরত্তি সেই গ্রহটাই আমাদের এত বিরাট পৃথিবী।'

হাতপাখাটা তুলে নিয়ে ঠাকুরমা নিজের আর দেবুর গায়ে হাওয়া করতে করতে বললেন, 'ওঃ, কি গরমই না পড়েছে আজ।'

দেবু বলল, 'সূর্য থেকে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে বসেই এতখানি গরম পাচ্ছি আমরা, তা হলে সূর্যের তাপ কি ভয়ানক, ভেবে দেখ দেখি।'

ঠাকুরমা স্তম্ভিতভাবে বললেন, 'ভেবে দেখে কি ওর কিছু আন্দাজ করা চলে, দাদু?'

'সত্যিই চলে না।' দেবু বলল, 'সূর্যের উত্তাপ যে কতখানি তা সঠিক বলতে আজ পর্যন্ত কেউ পারেন নি; সকলেই তার মাত্রা এখনও অনুমান করেই চলেছেন আর তার প্রমাণের চেষ্টায় লেগে আছেন।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'পৃথিবী তো বললাম এত বড়, এরকম সোয়ালক্ষ পৃথিবী একসাথে জড়ো করলে যত বড় হয় সূর্য তত বড়।'

'অ্যাত্-তো বড়!' ঠাকুরমা বললেন, 'অথচ দেখায় কতটুকু!'

'দেখাবেই।' দেবু বলল, 'এক লাটাই গুটোনো সুতো আকাশে সোজা হয়ে দাঁড়ালে তার মাথায় ঘুড়িটা এখান থেকে কতটুক দেখায়? সূর্য অত প্রকাণ্ড বলেই তবু প্রায় সাড়ে ন'কোটি মাইল দূর থেকে তাকে অতখানি দেখা যায়। সূর্য জিনিসটা কি শুনবে ঠাকুমা?'

শুনবেন তো বটেই। শুনবার জন্যই তো তিনি বসেছেন। সত্যি বলতে কি, দেবুর মুখে এসব আশ্চর্য কথা শুনে এসম্বন্ধে জানবার আগ্রহ তাঁর বুড়ো মনেও বেড়ে উঠেছে।

দেবু বলল, 'সূর্য হচ্ছে জ্বলন্ত গ্যাস-জাতীয় জিনিসের একটা প্রকাণ্ড বড় গোল পিণ্ড। তার ওপর সারাক্ষণ গ্যাসের ভীষণ আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলছে, সারাক্ষণ সে আগুনের ঝড় বইছে



সূর্যের পৃষ্ঠদেশে জ্বলন্ত গ্যাসীয় অগ্নিশিখার নৃত্য

সেখানে। জ্বলন্ত আগুনে লম্বা-খাটো আঁকা-বাঁকা শিখা থাকে তো?'

তা তো থাকেই, ঠাকুরমা মাথা কাত করে জানালেন।

দেবু বলল, 'সূর্যের জ্বলন্ত ঝড়ো আগুনেও সেরকম শিখা আছে; সচরাচর সে শিখা একশো থেকে ত্বশো-আড়াইশো মাইল পর্যন্ত লম্বা হয়।'

ঠাকুরমা ভীত বিস্মিত স্বরে বললেন, 'বাপ্‌রে!'

'বাপ্‌রে কি!' দেবু বলল, 'আগুনের ঝড় যখন বেশি

হয়ে ওঠে, সেই শিখা তখন এক এক সময় প্রায় আড়াই লক্ষ



সূর্যের চারদিকে আগুনের শিখা

মাইল পর্যন্ত লম্বা হয়ে ওঠে। সূর্য কত বড় জান? তার

যে-কোনো জায়গায় একটা কাঠি চালিয়ে দিয়ে ওপিঠ পর্যন্ত ফুঁড়ে বের করতে হলে আট লক্ষ সাতষট্টি হাজার মাইল লম্বা একটা কাঠির দরকার।'

একটু চুপ করে থেকে দেবু বোধকরি তত বড় একটা শলা সম্বন্ধে একটা ধারণা করবার চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'একটা ভয়ের কথা কিন্তু, ঠাক্‌মা!'

ঠাকুরমা বললেন, 'কি দাদু?'

দেব বলল, 'সূর্যের মতো আর তার চেয়েও বড় কোনো কোনো নক্ষত্রের কি দুরবস্থা হয়েছে জান না তো! সূর্যের মতো এমনি তাপ ছড়িয়ে ছড়িয়ে শেষ অবধি তাপ ফুরিয়ে গিয়ে তারা নিভে গিয়ে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। পণ্ডিতেরা বলেন, তাপ বিলিয়ে বিলিয়ে ফতুর হয়ে সূর্যও একদিন নিভে যাবে।'

ঠাকুরমা বললেন, 'তা হলে?'

দেবু বলল, 'আমিও তো ভাবছি, তা হলে আমরা বাঁচব কি করে? জান তো সূর্যের তাপ না হলে আমরা বাঁচতে পারি নে, সূর্যের তাপ না হলে গাছগাছড়া কিছু জন্মাবে না, আমরাও কিছু খেতে পাব না।'

ঠাক্‌রমা চিন্তিতভাবে বললেন, 'কি উপায় হবে তা হলে?'

দেবু হেসে উঠে বলল, 'সে ভাবনায় আমাদের মুখ না শুকিয়ে ফেললেও চলবে। গত দশ কোটি বছর ধরে সূর্য তাপ

তার আলো দান করে আসছে, ভবিষ্যতে আরো লক্ষ লক্ষ বছর সে আলো আর তাপ দান করবে। ততদিনে আমরাও কয়েক লক্ষ বার জন্ম নিয়ে কয়েক লক্ষ বার মরতে পারব।'

ঠাকুরমাও হেসে উঠলেন।

দেবু তার স্লেটখানা টেনে নিল। তার ডানদিকে নিচের কোণে একটা ছোট্ট গোল চিহ্ন দিয়ে বলল, 'এই মনে কর, ঠাক্‌মা, সূর্য।'

ঠাকুরমা বললেন, 'আচ্ছা।'

সূর্যের খানিক দূরেই ছোট একটা গোল দাগ কেটে বলল, 'এই মনে কর বুধ। বুধ-গ্রহই সবচেয়ে কাছে থেকে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। সবচেয়ে কাছে বলতে কত দূরে আছে জান? বুধ আছে সূর্য থেকে তিন কোটি বাট লক্ষ মাইল দূরে।'

ঠাকুরমা চোখ বড় করে বললেন, 'কাছে হল?'

'হল না?' দেবু বলল, 'অন্য-সব গ্রহ যে আরো দূরে। তা বুধ অত কাছে বলে সূর্যের তেজে তাকে খালি চোখে দেখতে পাওয়া কঠিন। আমাদের দেশের বড় বড় জ্যোতিষীরা জ্যোতিষের অঙ্ক কষে, বুধ কোন্ সময় সূর্যের থেকে কাছে থাকে কখন বা দূরে থাকে তা বছরের পঞ্জিকায় লিখে রাখেন। কখন বুধ সূর্য থেকে দূরে থাকে পঞ্জিকা দেখলেই সেই সময়টার ঠিক পাওয়া যায়।'

ঠাকুরমা বললেন, 'সব সময় তো বুধ সূর্য থেকে তিন কোটি ষাট লক্ষ মাইল দূরে থাকবে।'

দেবু বলল, 'মোটামুটি তাই থাকে বটে, কিন্তু সব-সময় তা থাকে না, গ্রহগুলোর ঘোরবার পথকে গোল মনে করে নেওয়া হয়, কিন্তু নানা কারণে সব গ্রহের পথ ঠিক গোল নয়। বুধের পথটা চ্যাপ্টা-গোল। তাই বুধ কখনও সূর্যের খুব কাছে গিয়ে পড়ে, কখনও বা কিছু দূরে সরে আসে। দূরে যখন থাকে তখন পাঁজি দেখে ঠিক করে নিতে হবে যে বুধ সূর্যের পূবদিকে আছে না পশ্চিমদিকে আছে।'

ঠাকুরমা বললেন, 'মনে কর, পাঁজিতে লেখা রয়েছে—পূবদিকে আছে।'

দেবু বলল, 'তা হলে সে সময় কোনো দিন সন্ধেবেলা সূর্য অস্ত যাবার ঠিক পরে খানিকক্ষণের জন্য বুধকে পশ্চিম-আকাশে দেখতে পাওয়া যাবে যেন ফুটকিমতো ছোট একটি তারা। আর বুধ যদি সূর্যের পশ্চিমদিকে থাকে তা হলে সে সময় কোনো দিন সূর্য উঠবার খানিক আগে অল্প একটু সময়ের জন্যে বুধকে দেখা যাবে পূব-আকাশে।'

'ভারি মজা তো!' ঠাকুরমা বললেন, 'পূবে হলে পশ্চিমে, আর পশ্চিমে হলে পূবে!'

দেবু হেসে মজাটা সমর্থন করল, তারপর বলল, 'দূরবীন দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, বুধ গোল, আর চন্দ্র যেমন দিনে

দিনে ক্ষয় হয় আবার দিনে দিনে বাড়ে, বুধও তেমনি হয়। গ্রহদের মধ্যে বুধ হল সবচেয়ে ছোট।'

ঠাকুরমা বললেন, 'তাই বুঝি জ্যোতিষীঠাকুর বলেন যে, বুধ ছেলেমানুষ?'

'হ্যাঁ, সে বেচারি আর কক্ষনো বড় হবে না, চিরকালের ছেলেমানুষ।'

দেব স্লেটের ওপর বুধ-বরাবর সূর্যের চারদিক ঘিরে গোল একটা সরু রেখা কেটে বলল, 'মনে কর যেন এই পথে বুধ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।'

ঠাকুরমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বুধের চাঁদ ক'টা?'

'বুধের একটাও উপগ্রহ নেই।' বলে বুধ থেকে একটু দূরে আর একটা ছোট্ট গোল চিহ্ন দিয়ে দেব বলল, 'এই মনে কর শুক্রগ্রহ। বুধের পরেই সূর্যের সবচেয়ে কাছে হল শুক্র।'

'সুয্যি থেকে তিনি ক'কোটি মাইল দূরে আছেন?' ঠাকুরমা জানতে চাইলেন।

'সুয্যি বল কেন ঠাকুরমা, সূর্য বলতে পার না?' মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গিতে তাঁর দিকে চেয়ে আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে দেব বলল, 'সূর্য থেকে শুক্র আছে ছয় কোটি সত্তর লক্ষ মাইল দূরে। শুক্রকে তো তুমি দেখেছই।'

ঠাকুরমা আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'আমি!'

'হ্যাঁ, তুমি।' দেব অল্প অল্প হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি

দেখেছ, আমি দেখেছি, বাবা মা দাদা সবাই দেখেছেন, আর এখনও দেখছেন।'

কথাটার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে না পেরে ঠাকুরমা হাঁ করে রইলেন।

দেবু তখন পরিষ্কার করে বলল, 'রোজ ভোররাতে সূর্য উঠবার আগে পুব-আকাশে একটা বড় তারা জ্বলজ্বল করে, সেটাকে দেখ নি?'

ঠাকুরমা বললেন, 'সে তো শুকতারা।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' দেবু বলল, 'শুক্রকেই চলতি কথায় বলা হয় শুক যেমন সূর্যকে বলা হয় সুয্যি। ওই শুকতারাই হচ্ছেন শুক্রগ্রহ। কোনো কোনো দিন সন্ধেবেলা পশ্চিম-আকাশেও শুক্রকে দেখা যায়।'

সারাজীবনের এত পরিচিত শুকতারাই শুক্রগ্রহ নামে একটা বিরাট ব্যাপার জেনে ঠাকুরমা পরম পুলকিত হয়ে উঠলেন, যেন যে-জিনিসটাকে এতকাল কাঁচ বলে তাচ্ছিল্য করেছেন সেটাই আজ হীরের টুকরো বলে জানা গেল! তিনি বললেন, 'আমাদের ছেলেবেলা আমার মা বলতেন, শুকতারা নাকি সুয্যির ছানা।'

দেবু হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ল। ঠাকুরমাও হাসতে লাগলেন; বললেন, 'সুয্যির ছানাই বটে, কত বড় তারাটি আর কিরকম জ্বলজ্বলে।'

দেবু বলল, 'শুক্র কেন এত উজ্জ্বল জান?'

ঠাকুরমা জানেন না, সুতরাং দেবু জানাতে লেগে গেল, 'পৃথিবীতে যেমন পাহাড়পর্বত-নদীসাগর সব রয়েছে, দূরবীন দিয়ে দেখে মনে হয়, শুক্রগ্রহেও তেমনি-সব উঁচু পাহাড় আর নিচু জলা জায়গা রয়েছে।'

ঠাকুরমা বললেন, 'পিথিমির মতো সেখানেও মানুষ আছে?'

'বোধ হয় না।' দেব বলল, 'সূর্যের তাপ সেখানে পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি পড়ে। সে তাপে কোনো জীবজন্তু বাঁচতে পারে না বলেই মনে হয়। আর এমনও হয়তো হতে পারে যে সূর্যের সেখানকার তাপ সয়ে বাচবার মতো কোনো প্রাণী সেখানে বাস করে। আজ পর্যন্ত জানা যায় নি সেখানে কোনো প্রাণী আছে কিনা।'

ঠাকুরমা যেন সে-সম্বন্ধে কিছু একটা স্থিরসিদ্ধান্ত করবার জন্যই ভাবতে লাগলেন। দেবু তাতে বাধা দিয়ে বলল, 'সূর্যের তাপে পৃথিবীর জল তো বাষ্প হয়ে পৃথিবীর ওপরটাকে মেঘে ঢেকে দেয়। শুক্র সূর্যের আরো কাছে বলে আরো বেশি করে তাপ পায়, তাতে তার জল আরো বেশি করে বাষ্প হয়ে ওঠে, তাই সেখানে আরো বেশি মেঘ হয়; সেই বেশি মেঘে সূর্যের বেশি তাপ পড়ায় শুক্রের জ্যোতি আর-সব গ্রহের চেয়ে বেশি। তাই শুক্রকে অমন উজ্জ্বল দেখায়।'

এতকালের প্রায় নিত্যদেখা শুকতারাকে ঠাকুরমার কাছে

রীতিমতো রহস্যময় বলে মনে হতে লাগল। দেবু তার স্লেটে শুক্রগ্রহ জুড়ে সূর্যের চারদিকে গোল করে তার ঘুরবার পথ এঁকে বলল, 'শুক্র যে পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে সে পথ কিন্তু ঠিক গোল।'

ঠাকুরমা বললেন, 'শুক্রও তো গোল?'

'সব গ্রহই মোটামুটি গোল। দেবু বলল, 'শুক্র তো একেবারেই গোল। শুক্রের মাঝ-বরাবর যদি লোহার একটা শলা দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলতে চাও, তাতে সাত হাজার ছ'শো যাট মাইল লম্বা একটা শলা দরকার হবে।'

'বাব্বাঃ!' ঠাকুরমা বললেন, 'কাজ নেই, দাদু, এফোঁড়-ওফোঁড় করে।'

দেবু হাসতে লাগল। তারপর বলল, 'শুক্রের ক'টা চাঁদ আছে বল দেখি?'

ঠাকুরমা বললেন, 'কি জানি!'

'কেন, কাল তো বলে দিলাম। মনে নেই বুঝি? কালএর কথা কালে খেয়েছে, না?' দেবু বলল, 'শুক্রের একটাও উপগ্রহ নেই।'

ঠাকুরমা বললেন, 'পিথিমি তো তা হলে শুক্কুর আর বুধের কাছে গুমোর করতে পারে।'

'পারে বই কি!' দেবু বলল, 'পৃথিবী আকারে-ওজনেও তো শুক্র আর বুধের চেয়ে বড়।'

ঠাকুরমা শুদ্ধ করে বলবার চেষ্টা করলেন—পাছে আবার নাতি না দোষ ধরে বসে। বললেন, 'পিরথিবি আছেন কত দূরে ?'

'শুক্রের পরেই সূর্যের কাছে আছে পৃথিবী।' বলে শ্লেটে শুক্রের একটু দূরে দেবু আর-একটা ছোট্ট গোলক এঁকে বলল, 'এই মনে কর যেন পৃথিবী।'

এতক্ষণে পৃথিবীর কথা এল দেখে ঠাকুরমা খুশি হলেন।

দেবু তাঁর পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করল, 'পৃথিবীর আকার কিরকম বল দেখি ?'

সৌরজগৎ সম্বন্ধে এতক্ষণ যা শুনলেন সবই তো গোলে-গোল, সুতরাং ঠাকুরমা অতি সহজেই বলে ফেলতে পারলেন, 'পৃথিবী তো গোল।'

'ঠিক গোল কিন্তু নয়।' দেবু বলল, 'যার চেয়ে গোল আর হতে পারে না এমন একটা কুমড়োর কথা ভাব দেখি, সেটা কি সব দিকে ঠিক গোল ?'

ঠাকুরমা ভাবতে লাগলেন। তিনি ভেবে চিন্তে উত্তর দেবেন—অত ধৈর্য দেবুর নেই। সে বলল, 'কুমড়োর ওপরে বোঁটার জায়গাটা আর ঠিক তার নিচ-বরাবর তলাটা একটু গর্ত-মতন নয় ?'

'তা বটে,' ঠাকুরমা বললেন, 'অত কি খেয়াল থাকে, দাদু ?'

'খেয়াল থাকা ভালো।' দেবু বলল, 'পৃথিবীটাও ঠিক

ওই গোল-কুমড়োর মতো গোল, উত্তরদিক আর দক্ষিণদিকটাতে একটু চাপা গর্তমতো।

অর্থহীনভাবেই ঠাকুরমা হেসে বললেন, 'বাবাঃ, গর্তমতো চাপা কেন আবার?'

দেবু গম্ভীরভাবে বলল, 'তারও কারণ আছে। আচ্ছা, নরম একতাল কাদামাটির মাঝখান দিয়ে একটা কাঠি চালিয়ে দিলাম। এখন সেই কাঠিটার দুদিক ধরে খুব জোরে ঘোরাতে লাগলাম—একেবারে বন্‌বন্ করে। মাটিটার অবস্থা তা হলে কি হবে বল দেখি?'

ঠাকুরমা বললেন, 'সেটা পাক খেয়ে খেয়ে গোল হয়ে উঠবে।'

এ উত্তরে খুশি হয়ে দেবু বলল, 'কাঠি-জুড়ে দুদিকে মাটির গোলার অবস্থাটা কিরকম হবে?'

'তা, ভেতরদিকে একটু চাপ খেয়ে যাবে।' ঠাকুরমা বললেন, 'কিন্তু পৃথিবী তো আর কাদামাটির তাল নয়!'

'কাদামাটির নয়,' দেবু বলল, 'পৃথিবী এখন শক্ত মাটির বিরাট একটা তাল, কিন্তু একেবারে গোড়ার দিকে এর মাটি ছিল নরম, জন্ম থেকেই তো পৃথিবী ঘুরছে। তাই তারও দুদিক চাপা।'

ঠাকুরমা বিস্ময়দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'পৃথিবী কি একটা কাঠির গায়ে জড়িয়ে ঘুরছে?'

'না না না,' দেবু হেসে বলল, 'কাঠিতে জড়িয়ে ঘোরালে

মাটির তালটা যেমন ঠিক এদিক-ওদিক না হয়ে সমানভাবে ঘুরবে, পৃথিবীও তো সেইভাবে ঘুরছে, তাই কাঠির গায়ে না জড়িয়েও তার দুটো দিক চাপা। তোমায় বোঝাবার সুবিধের জন্যে কাঠির কথা বললাম।'

ঠাকুরমা বললেন, 'কিন্তু পৃথিবী তো সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাঠির গায়ে মাটির তালের সঙ্গে তার তুলনা হবে কেন?'

'হবে বই কি!' দেবু বলল, 'পৃথিবীর তো হাত-পা নেই যে তুমি যেমন হেঁটে হেঁটে তুলসীগাছ প্রদক্ষিণ কর তেমনি করে ঘুরবে। গোল জিনিস চলতে হলেই গড়িয়ে গড়িয়ে চলবে।'

দেবু লাফিয়ে উঠে তার ব্যাটবলটা পেড়ে নিয়ে বসল। বলটার দুদিকে দুহাতের তর্জনী-আঙুল দিয়ে চেপে সেটাকে মেজের ওপর দিয়ে গড়িয়ে নিতে লাগল। বলল, 'দেখ তো বলটা কি ভাবে চলছে, নিজের চারদিকেই বলটা ঘুরছে না?'

তা ঘুরছে, ঠাকুরমাকে বলতেই হল। দেবু বলল, 'পৃথিবীও গোল জিনিস, তাকেও এমনি করেই ঘুরতে হয়।'

ঠাকুরমা বললেন, 'তা হলে পিরথিবি নিজের চারদিকেও ঘুরছে আর তেমনি করে ঘুরতে ঘুরতে সুয্যির চারদিকেও ঘুরছে?'

'হ্যাঁ, পৃথিবী দুরকম করে ঘুরছে।' দেবু বলল, 'নিজের চারদিকে যতক্ষণে একবার ঘুরছে ততক্ষণে আমাদের এক দিন--

অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টা অর্থাৎ একটা সূর্যের আলোর দিন আর একটা চাঁদের আলোর রাত মিলে এক সূর্যোদয় থেকে আর-এক সূর্যোদয় পর্যন্ত পুরো একটা দিন।'

একটু যেন গোলমালে পড়ে ঠাকুরমা হাঁ করে রইলেন। দেবু এর জন্যে আগে থেকে তৈরি ছিল।

সে চট্ করে উঠে টেবিল-ল্যাম্পটা নামিয়ে এনে সামনে রাখল। দেশলায়ের কাঠি জ্বেলে ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে তাতে চিম্‌নি পরিয়ে বলল, 'এই মনে কর, সূর্য।'

মজা পেয়ে ঠাকুরমা হাসিমুখে কাণ্ড দেখতে লাগলেন। দেবু উঠে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ঘর অন্ধকার করে দিল। তারপর ব্যাট্‌বলটা বাতির শিখার সমান উঁচুতে একটু দূরে ধরে বলল, 'বাতির আলোয় বলটার কতখানি আলো পাচ্ছে দেখ তো।'

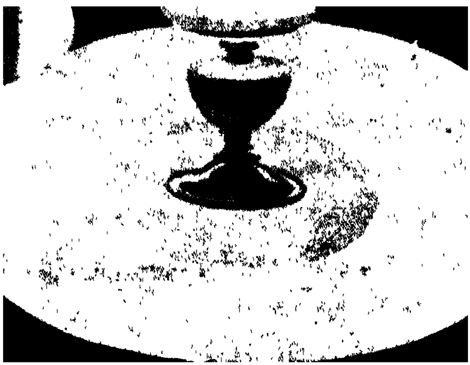
ঠাকুরমা দেখে বললেন, 'বাতির দিকে বলএর যে-দিকটা আছে সে-আধখানা আলো পাচ্ছে আর কি!'

দেবু বলল, 'বাতির আলোটা তো, বললাম, সূর্য, আর এই বলটা, মনে কর, পৃথিবী। এখন এই পৃথিবীর যতটা সূর্যের দিকে থেকে সূর্যের আলো পাচ্ছে সে অর্ধেক অংশে হল দিন; পৃথিবীর বাকি আধখানা আছে অন্ধকারের দিকে, সে আদ্ধেক অংশে এখন রাত।'

দেবুর একটা বড় গোল লাট্টু আছে। সেটা পেড়ে নিয়ে সে

বলল, 'মনে কর, ঠাক্‌মা, এটা পৃথিবী, আর এর গজালটা মনে কর মেরুদণ্ড —যার ওপরে পৃথিবী ঘুরছে।'

ঠাক্‌রমাকে মনে করতেই হল।



আলোর একপাশে মেজেতে দেবু লাট্টুটা ঘুরিয়ে দিল। ঘুরতে ঘুরতে লাট্টু একদিকে চলতে লাগল।

সে বলল, 'দেখ, পৃথিবী নিজের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে চলেছে। এমনি করে মেরুদণ্ডের ওপর একবার ঘুরতে যতক্ষণ

লাগে ততক্ষণে তার এক দিন। প্রত্যেক সময়েই পৃথিবীর আধখানা আছে সূর্যের দিকে সে-আধখানায় তার দিনের বেলা, আর বাকি আধখানা সূর্যের আলো পাচ্ছে না বলে সেখানে অন্ধকার -সে হল রাতের বেলা।'

ঘুরে ঘুরে লাট্টুটা পড়ে গেল, দেবু সেটা তুলে রেখে বলল, 'পৃথিবীও ঠিক এমনি করে মেরুদণ্ডের ওপর পাক খেতে খেতে এগিয়ে চলে। তবে লাট্টুটা যেমন খুশি পথ করে চলেছে, পৃথিবী কিন্তু নিজের নির্দিষ্ট পথে চলে চলে সূর্য-প্রদক্ষিণ করে।'

এত করে বোঝাবার পর ঠাকুরমার কাছে ব্যাপারটা আর ঝাপসা রইল না। দেবু বলল, 'এমনি করে এক দিনে একবার করে পাক খেতে খেতে এগিয়ে চলে চলে যতদিনে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে পারে ততদিনে হল এক বৎসর।'

ঠাকুরমা বললেন, 'এক বছরে তো তিনশ পঁয়ষট্টি দিন।'

'হ্যাঁ, তার মানে, তিনশ পঁয়ষট্টি দিনে পৃথিবী সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে।' দেবু বলল, 'এই এক বছর ধরে সূর্যের চারদিকে ঘোরাকে বলা হয় পৃথিবীর বার্ষিক গতি অর্থাৎ বচ্ছরকার চলা, আর নিজের মেরুদণ্ড ঘিরে পৃথিবীর যে একদিনে একবার পাক খাওয়া তার নাম আহ্নিক গতি বা দৈনিক গতি - মানে দিনের চলা।'

ঠাকুরমা একটু ভক্তিভরেই বললেন, 'দেখ দেখি, ভগবান মানুষের জন্যে কেমন সুন্দর হিসেব করে দিন, রাত, বছর ঠিক করে দিয়েছেন।'

'হ্যাঃ! ভগবানের তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই!' দেবু বলল, 'ভগবান কিচ্ছু হিসেবপত্র করেন নি। মানুষ ভগবানের সেই ছেলে আর কি যে এর জন্যে ভগবানের দিকে চেয়ে থাকবে।'

ঠাকুরমা প্রশ্ন করলেন, 'তবে?'

'তবে আর কি?' দেবু উত্তর দিল, 'মানুষ নিজের দরকারে নিজেই এসব ভাগ করে নিয়েছে। প্রথমে মানুষ দেখল, একটানা খানিকটা সময় সূর্যের আলোর পর নিয়মিতভাবে আবার একটানা খানিকটা সময় অন্ধকার হচ্ছে। আলোকের সময়টার নাম দিল সে দিন, আর অন্ধকার সময়টার নাম দিল—রাত।'

ঠাকুরমা বললেন, 'বেশ দিনের পর রাত আর রাতের পর দিন হয়ে চলল।'

'হাঁ।' দেবু বলল, 'কিন্তু দেখা গেল, দিন আর রাত সমান সমান হচ্ছে না। তখন লক্ষ্য করে করে দেখা গেল, একটা দিনে আর একটা রাতে মিলে প্রত্যেক বারই সমান সমান হচ্ছে।'

'হবেই,' ঠাকুরমা বললেন, 'লাট্টুর মতো নিজের চারদিকে এক-একবার করে ঘুরতে প্রত্যেক বারই তার একই সমান সময় লাগছে।'

দেবু বলল, 'লাট্টুর বেলা তা হয় না, কেন-না, তার ঘোরার

বেগ ক্রমেই কমে আসে, কিন্তু পৃথিবী সমান তালে ঘুরছে, তাই তার নিজের মেরুদণ্ডের ওপর প্রত্যেকবার ঘুরবার সময়ই সমান।'

ঠাকুরমা বললেন, 'তা হলে, দেখা গেল, দিনে আর রাতে মিলে রোজকার দিনই এক সমান।'

'হ্যাঁ, এক সমান।' দেবু বলল, 'মানুষ নিজের সুবিধের জন্যে প্রত্যেক দিনকে কতগুলো সমান ভাগে ভাগ করে নিল।'

ঠাকুরমা বললেন, 'অষ্ট-পহরে একদিন তো?'

'অষ্ট-প্রহরে।' দেবু বলল, 'আমাদের ভারতবর্ষের পণ্ডিতেরা এক দিনকে আট ভাগ করে, তার এক এক ভাগের নাম দিলেন—প্রহর। এক এক প্রহরকে আবার সাড়ে সাত ভাগ করে তার এক এক ভাগের নাম দিলেন দণ্ড।'

'ও মা,' ঠাকুরমা বললেন, 'তাকেই বলে বুঝি দণ্ড?'

'তাকেই বলে দণ্ড।' দেবু বলল, 'সেই প্রত্যেক দণ্ডকে আবার ষাট পল-এ ভাগ করা হল, প্রত্যেক পলকে ভাগ করা হল ষাট বিপল-এ; আর প্রত্যেক বিপলকে ভাগ করা হল ষাট অনুপল-এ।'

'অ্যাত্তো ভাগ?' ঠাকুরমা বললেন, 'এক অনুপল তা হলে কতটুকুন সময়!'

দেবু একটু হেসে বলল, 'মনে মনে ভেবেই দেখ।'

তাঁর মধ্যে ভেবে দেখার কোনো চেষ্টাই দেখা গেল না। তিনি বললেন, 'তা হলে ঘণ্টা-মিনিট এসব করল কা'রা?'

দেবু বলল, 'ঘণ্টা-মিনিটের ভাগ করেছেন পশ্চিমের পণ্ডিতেরা। তাঁরা দিন-রাতে মিলে যে এক-একটা দিন, তাকে চব্বিশ ভাগে ভাগ করে এক-এক ভাগের নাম দিলেন- ঘণ্টা। এক-এক ঘণ্টাকে ভাগ করলেন ষাট মিনিট-এ, আর এক-এক মিনিটকে ভাগ করলেন ষাটটি সেকেণ্ড-এ।'

ঠাকুরমা বললেন, 'ঘণ্টা-মিনিট-সেকেণ্ড তো ঘড়ি দেখে ঠিক পাওয়া যায় —'

তাঁর কথা শেষ না হতেই দেবু বলল, 'হ্যাঁ, সেই ভাগ-হিসেবে সময় ঠিক রাখবার জন্যে পশ্চিমের পণ্ডিতেরা ঘড়ি-যন্ত্রের আবিষ্কার করলেন।'

ঠাকুরমা তাঁর কথা শেষ করলেন, 'দণ্ড-পল-বিপল ঠিক পাওয়ার জন্যে আমাদের দেশের কোনো যন্তর হয় নি ?'

দেবু বলল, 'এ দেশের লোকের তখন খাবার ভাবনা ছিল না, তাই সাধারণ লোকের চুলচেরা সময়-হিসেবের দরকারও ছিল না। দিনের বেলা নিজের শরীরের ছায়া মেপেই মোটামুটি সময়ের নিরিখ পাওয়া যেত।'

'আর, রাতের বেলা ?'

'রাতের বেলা তো বিশ্রামের আর ঘুমোবার সময়।' দেবু হেসে বলল, 'তবু, জ্যোতিষী পণ্ডিতেরা, যাঁদের চুলচেরা সময়-হিসেবের দরকার ছিল, তাঁরা একটা যন্ত্রও করেছিলেন।'

'কি রকম যন্তর ?'

দেবু বলল, 'একটা বাটির তলায় ছোট্ট একটা ফুটো করে সেটা জলের ওপর ভাসিয়ে দেওয়া হত। বাটির ভেতর হিসেব করে দাগ কাটা থাকত, ফুটো দিয়ে জল যে দাগ পর্যন্ত উঠল তাই দেখে সময় ঠিক করা হত।'

'অল্পে অল্পে জল উঠে উঠে পুরো একদিনে বুঝি বাটিটা ডুবে যেত?'

'তাই হবে।' দেবু বলল, 'আর তা না হলে, হয়তো এক-প্রহরে, নয়তো এমনি একটা নির্দিষ্ট সময়ে বাটিটা ডুবে যেত। যাই হোক, সে যন্ত্রটা মোটের ওপর নটখটে ছিল—সুবিধের ছিল না। তার তুলনায় এখনকার ঘড়ি বেশ সহজ যন্ত্র, তাই সেটারই চল হয়ে গেছে সারা পৃথিবীতে।'

ঠাকুরমা বললেন, 'তাই এখন দণ্ড-পল শুধু পাঁজিতেই লেখা থাকে, লোকে তার খবরও রাখে না।'

দেবু শুধু একটু হাসল।

ঠাকুরমা কতক্ষণ নীরবে পাখার হাওয়া খেয়ে এবং খাইয়ে বললেন, 'মেরুদণ্ড যে বললে, পিথ্থিবীর আবার মেরুদণ্ড কি?'

দেবু বলল, 'পৃথিবীর উত্তরে আর দক্ষিণে যে কিছু চাপা, সে দু'জায়গাকে বলা হয় উত্তরমেরু আর দক্ষিণমেরু। উত্তরমেরুর আর-এক নাম সুমেরু আর দক্ষিণমেরুর অন্য নাম কুমেরু। বুঝেছ?'

ঠাকুরমা ঘাড় কাত করে জানালেন, তিনি বুঝেছেন।

দেবু বলল, 'এক মেরুর ঠিক মাঝের বিন্দু দিয়ে চালিয়ে অন্য মেরুর ঠিক মাঝের বিন্দু ভেদ করে যদি একটা ডাণ্ডা ফুঁড়ে দেওয়া যায় তা হলে পৃথিবী সেই ডাণ্ডা জুড়েই ঘুরবে তো ?'

'তা তো ঘুরবেই।' ঠাকুরমা উত্তর দিলেন।

দেবু বলল, 'বুঝবার আর বোঝাবার সুবিধের জন্যে দরকার-মতো পৃথিবীকে এফোঁড়-ওফোঁড়-করা একটা কাঠি বা ডাণ্ডা, বা ভালো কথায় দণ্ড, মনে মনে কল্পনা করে নেওয়া হয়। তারই নাম মেরুদণ্ড। আসলে মেরুদণ্ড বলে পৃথিবী-বেঁধা কোনো শূল নেই।'

দেবু হঠাৎ উঠে পড়ল, অনেক কসরত করে আলমারির মাথার ওপর থেকে 'গ্লোব' মানে ভূ-গোলকটা নামিয়ে নিয়ে এসে, ঠাকরমাকে দেখিয়ে বলল, 'এ হচ্ছে পৃথিবীর ছোট্ট মূর্তি। দেখ, এর মাঝখান দিয়ে এই লোহার শলাটা রয়েছে।'

সে ঘুরিয়ে দেখাল, ঘোরালেই সেই শলা অবলম্বন করে গোলকটা বেশ ঘোরে।

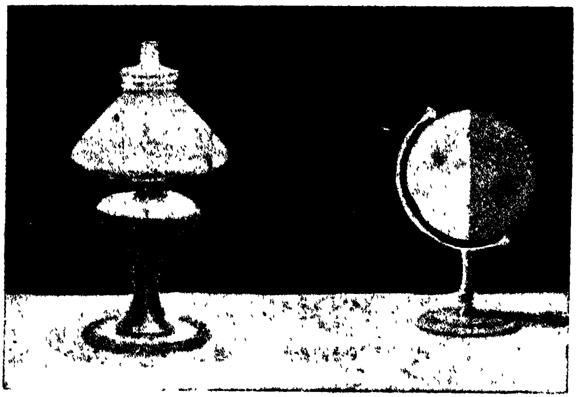
শূলে বেঁধা ব্যাচারির দুরবস্থা দেখে ঠাকরমার ভারি হাসি পেল।

দেবু বলল, 'এরকম বুঝবার আর বোঝাবার সুবিধের জন্যে পৃথিবীকে ঘিরে, তাকে ভাগ করে অনেক কিছুই মনে করে নেওয়া হয়। যেমন ধর বিষুবরেখা।'

ঠাকুরমা হেসে বললেন, 'সে আবার কি দ্রব্যো ?'

মহাকাশ

'দ্রব্যটা হচ্ছে' —দেবু বলল, 'সুমেরু আর কুমেরু থেকে ঠিক সমান দূরে পৃথিবীর মাঝ ঘিরে একটা রেখা কল্পনা করা হয়, সেটার নাম বিষুবরেখা। বিষুবরেখা থেকে সমান সমান দূরে উত্তরদিকে আর দক্ষিণদিকে যতগুলো রেখা কল্পনা করা যায়, সেগুলোর নাম অক্ষরেখা।'



ল্যাম্প ও গ্লোব

ভূ-গোলকের মাঝ দিয়ে ঘুরিয়ে আঁকা বিষুবরেখা দেবু দেখিয়ে দিল।

তা থেকে দুদিকে সমান দূরে দূরে যে আরো কয়টি রেখা রয়েছে তা দেখিয়ে ঠাকুরমা বললেন, 'এগুলো বুঝি- '

বোঝা গেল, নামটা তিনি ভুলে গেছেন; দেবু তা মনে করিয়ে দিল, 'অক্ষরেখা।'

ঠাকুরমা বললেন, 'পৃথিমির উত্তরদিকের থেকে দক্ষিণ অবধি রেখা নেই ?'

'না, রেখা কোনদিকেই নেই,' দেবু বলল, 'কিন্তু আছে বলে মনে করে নেওয়া হয়। উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি রেখার নাম দ্রাঘিমা।'

দেবুদের বাড়িটা নদীর ধারে। খোলা জানালা দিয়ে দুপুরের সেই ঝকঝকে রোদে নদীটিকে দেখাচ্ছিল ভারি চমৎকার। সেদিকে চেয়ে ঠাকুরমা বললেন, 'পিথিমি বুঝি একেবারে একটেরে আকাশের গা ছুঁয়ে রয়েছে ?'

দেবু বলল, 'আকাশের আবার গা কি ? আকাশ তো কিচ্ছু না, তাই তাকে বলে শূন্য। সেই শূন্যেই তো রয়েছে গ্রহ নক্ষত্র সব।'

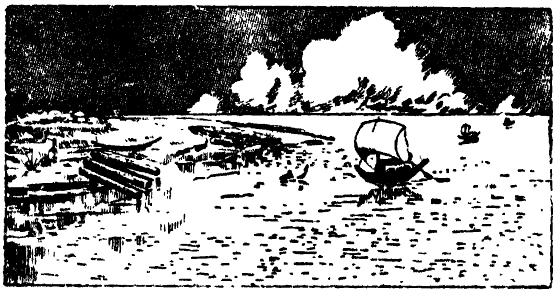
ঠাকুরমা নদীর দিকে দেখিয়ে বললেন, 'ওদিকে যে পিথিমি একেবারে আকাশ ছুঁয়ে রয়েছে !'

'শুধু ওদিকে কেন,' দেবু বলল, 'যেদিকেই বড় মাঠ, নদী, সাগর রয়েছে তার একপাশে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকালে মনে হয় যেন অনেক দূরে আকাশ নিচু হয়ে এসে পৃথিবীকে ছুঁয়েছে। যেখানে আকাশে পৃথিবীতে মিলেছে বলে মনে হয় তাকে বলা হয় - দিগন্ত।'

ঠাকুরমা অনেকক্ষণ সেই দিগন্তের পানে চেয়ে রইলেন, - - যেন কি ভাবলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, দাদু,

সূয্যি যদি পিত্থিমির চারদিকে না-ই ঘুরবেন, তা হলে তিনি সকালবেলা উদয় হয়ে সারাদিনে গোটা আকাশটা ঘুরে সন্ধ্যাবেলা অস্তে যান কেমন করে?'

দেবু বলল, 'পৃথিবী যে লাট্টুর মতো আপন মেরুদণ্ডের ওপর রোজ একবার করে ঘুরছে—সে পশ্চিমদিক থেকে পুবদিকে



দিগন্ত

ঘুরছে। আমরা পৃথিবীর যে অর্ধেকের ওপর আছি তা যখন সূর্যের দেখা পায় তখন সূর্য রয়েছে পুবদিকে, কাজেই আমাদের মনে হয়, সূর্য পুবদিকে উঠছে।'

ঠাকুরমা বললেন, 'তা হলে সে সময় ঠিক সূর্যের সোজাসুজি জায়গায় যারা রয়েছে তাদের তো দুপুরবেলা।'

'ঠিক বলেছ, ঠাকুরমা।' দেবু বসা-অবস্থায়ই প্রায় নেচে ফেলল। বলল, 'এমনি করে আমাদের অর্ধেক যখন সূর্যের আলো পেরিয়ে অন্ধকারের দিকে ঘুরে চলেছে, তখন আমাদের

মনে হয় যেন সূর্য পশ্চিমদিকে নেমে যাচ্ছে, আমরা তাকে বলি সূর্যের অস্ত-যাওয়া।'

ঠাকুরমা আবার খানিকটা ভেবে বললেন, 'কিন্তু পিরথিবী যে চলছে তা তো আমরা টের পাচ্ছিনে, বরং মনে হয় যেন সুয্যিটাই চলছে।'

দেবু বলল, 'পৃথিবী তো আমাদের নিয়ে আর আমাদের এ-সব বাড়িঘর নিয়েই ঘুরছে। পৃথিবীর ঘোরা সত্ত্বেও আমরা একই জায়গায় আছি, সরে যাচ্ছিনে ; তা ছাড়া পৃথিবীর তুলনায় আমরা এত ক্ষুদ্র যে তার ও ঘোরাঘুরির ব্যাপার আমরা টেরই পাইনে। আর সূর্য চলছে বলে যে মনে হয় সে ভুলটাও এমনিই অনেক সময় হয়। রেলগাড়ি চলেছে খুব জোরে, তার ভেতর থেকে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে মনে হয় যে, বাইরেকার গাছপালা-মাঠঘাটগুলোই জোরে ছুটে যাচ্ছে, আর গাড়িসমেত আমরা এক জায়গায় স্থির বসে আছি।'

ঠাকুরমা হেসে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, দাদু, তা মনে হয় বটে।' তারপরই আবার গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কিন্তু পিরথিমি যে ঘুরছে তাতে তার নিচের দিকে গেলে আমাদের তো মাথা নিচের দিকে আর পা ওপরদিকে হয়ে যাচ্ছে, তাতে আমরা পড়ে যাই না কেন ?'

দেবু বলল, 'প্রত্যেক গ্রহ, উপগ্রহেরই নিজের নিজের দিকে টানবার ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতায় পৃথিবী আমাদের মাটির

দিকে টেনে রাখে, তাই আমরা পড়ে যাই না। আর আকাশ তো পৃথিবীর সবদিকেই, তাই পৃথিবীর সাথে সাথে আমরা যেদিকেই ঘুরে যাই না কেন আমাদের মাথা সব সময় ওপরের দিকে -অর্থাৎ আকাশের দিকে, আব পা তো মাটিতে আছেই।'

নদীর দিকে চেয়ে দেবু বলে উঠল, 'দেখ, ঠাম্মা, ও-ই দূরের দিকে চেয়ে দেখ, একখানা নৌকো আসছে, নয় ?'

ঠাকুরমা তা দেখতে পেলেন।

দেবু বলল, 'দেখ, নৌকোটার শুধু পালের ওপর-দিককার একটুখানি নিয়ে পাল বাঁধা মাস্তুলের ডগাটুকু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নৌকোটার দিকে চেয়ে থাক।'

ক্রমে কতক্ষণ পরে নৌকোর সবটা পাল দেখতে পাওয়া গেল। আরো কতক্ষণ পরে লোকজন আর ছই-সমেত নৌকোর দেহটা দেখা দিল। আরো পরে সবটা নৌকো তার সবকিছু নিয়ে তাদের সামনে নদীর ওপর স্পষ্ট হয়ে উঠল।

দেবু বলল, 'পৃথিবীটা গোল বলে দূরের দিকে নিচের মুখে গড়িয়ে গেছে, তাই প্রথমে সবটা নৌকো আমরা দেখতে পাই নি। গোল না হয়ে পৃথিবী যদি সমতল হত তা হলে দূরে যখন ছিল তখনও সবটা নৌকোই আমরা দেখতে পেতাম- অবশ্য দূরে আছে বলে ছোট আকারে দেখতে পেতাম।'

এতক্ষণ চুপচাপ একদিকে চেয়ে থাকায় ঠাকুরমার হাতের পাখা অচল ছিল, সুতরাং এরই মধ্যে দুজনেরই এক গা করে

ঘাম দেখা দিয়েছে। ঠাকুরমা তাড়াতাড়ি পাখাটা তুলে নিয়ে দুজনেরই গায়ে হাওয়া করতে করতে বললেন, 'বাপরে বাপ, গরমিকালের দিনগুলো কি লম্বা—ফুরোতেই চায় না আর।'

দেবু বলল, 'আচ্ছা, ঠাম্‌মা, পৃথিবীর আদ্ধেকটার ওপর সব সময়ই তো সূর্যের আলো সমানভাবে পড়ছে, তা হলে সব জায়গাতেই তো দিন যতখানি রাতও ঠিক ততখানি হওয়া উচিত। তা না হয়ে কখনও দিন বড় আর কখনও রাত বড় হয় কেন বলতে পার?'

ব্যাচারি ঠাকুরমা কি করে এ প্রশ্নের উত্তর দেবেন? দেবুকেই সেটা বলে দিতে হল, 'পৃথিবীর দুই মেরু ভেদ করে যে মেরুদণ্ড কল্পনা করা হয় সেটা ঠিক ওপরদিকে সোজা খাড়া হয়ে নেই, একটু হেলানভাবে আছে; কাজেই পৃথিবীর সব জায়গায় সব সময় সমান আলো বা সমান অন্ধকার হতে পারে না, এই জন্যেই দিনরাত ছোট-বড় হয়।'

ঠাকুরমা ভূ-গোলকটার দিকে চেয়ে বললেন, 'তাই বুঝি তোমাদের ওই গোলোব্-এর মাঝ দিয়ে ওই লোহার শলাটা খাড়া না করে অমন হেলিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'হ্যাঁ, ছোট গ্লোব্-এর ছোট মেরুদণ্ডের মতো বড় গ্লোব্ মানে পৃথিবীরও একটা প্রকাণ্ড বড় মেরুদণ্ড কল্পনা করে নেওয়া হয়। মেরুদণ্ড যে দুদিক দিয়ে ভেদ করেছে বলে ধরা হয় সেই উত্তর আর দক্ষিণ মেরুই হল একটু চাপা, চেয়ে দেখ।'

মহাকাশ

দেবুর দেখানো-মতো গ্লোব্-এ ঠাকুরমা সুমেরু কুমেরু দেখে পুলকিত হলেন।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে দেবু বলল, 'প্রত্যেক বছরকার পাঁজিতে পৌষমাসের দশ তারিখে লেখা থাকে বড়দিন, তার মানে কি জান, ঠাম্‌মা?'

ঠাকুরমা বললেন, 'সে তো সাহেবদের বড়দিন বলে।'

'হ্যাঁ, খ্রীস্টানদের সে সময় এক্‌স্‌মাসের উৎসব হয়।' দেবু বলল, 'বছরের মধ্যে ন'ই পৌষের রাত হল সবচেয়ে বড় রাত, তার পরদিন দশই পৌষ থেকে দিন বড় হওয়া শুরু হল, তাই সে-দিনকে বলা হয় বড়দিন।'

ঠাকুরমা প্রশ্ন করলেন, 'আর, সবচেয়ে বড় দিন হয় কবে?'

দেবু বলল, 'সবচেয়ে বড় দিন ন'ই আষাঢ়, সেদিনকার রাত হল সব চেয়ে ছোট, তার পরদিন দশই আষাঢ় থেকে রাত বড় হওয়া আরম্ভ হয়।'

ঠাকুরমা বললেন, 'দিনরাতের এরকম বাড়তি কমতি হতে হতে সমান-সমান দিন-রাতও তো তা হলে হয়?'

'নিশ্চয়ই হয়।' দেবু বলল, 'আশ্বিনমাসের দশ তারিখে আর চৈত্রমাসের দশ তারিখে দিন আর রাত হয় একেবারে সমান সমান।'

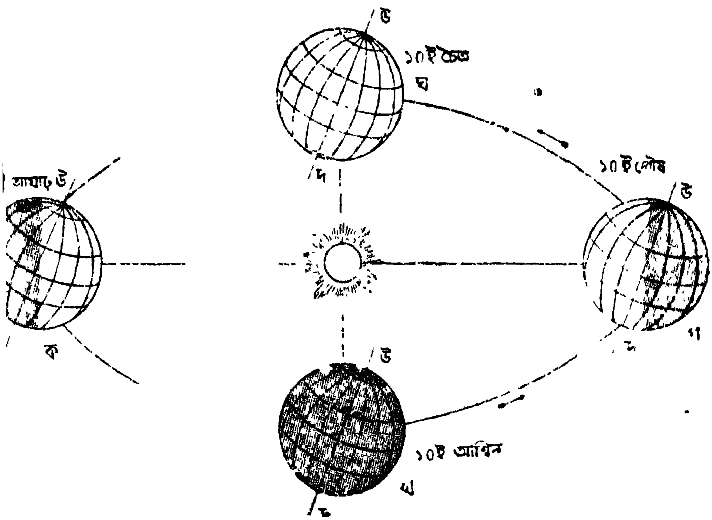
ঠাকুরমা চুপ করে ব্যাপারটা গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন।

দেবু বলল, 'পৃথিবীর এই হেলে থাকার দরুন সবচেয়ে মজা

হয় উত্তরমেরুতে আর দক্ষিণমেরুতে। সেখানে একেবারে একটানা ছ'মাস ধরে এক-একটা দিন আর ছ'মাস ধরে এক একটা রাতই হয়।'

ছ-য় মা-স! ঠাকুরমার দুচোখ মস্ত বড় বড় হয়ে উঠল।

দেবু বলল, 'সূর্যের এই কম আলো আর বেশি আলোর



দরুনই আমাদের দেশে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত ছয় রকমের আবহাওয়ার ছ'টা ঋতু বছর-বছর দেখা দেয়।'

ঠাকুরমা নিজের জ্ঞান প্রকাশ করলেন, 'দু মাসে তো এক ঋতু?'

দেবু বলল, 'পণ্ডিতেরা দেখলেন যে, সেই আট প্রহরের বা চব্বিশ ঘণ্টার এক-একটা দিনে একপাক করে মোট তিনশ-পঁয়ষট্টিটা পাক খেয়ে তিনশ পঁয়ষট্টি দিনে পৃথিবী সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। এই সময়টার নাম দিলেন তাঁরা – বৎসর।'

ঠাকুরমা বললেন, 'সেই বছরকে বুঝি নিলেন আবার বারো ভাগ করে?'

'নিলেন,' দেবু বলল, 'কিন্তু খামখেয়ালিমতো যে নিলেন, তা নয়। এদিকে দেখা গেল, পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে চন্দ্রের লাগছে সাড়ে উনতিরিশ দিন, সেটাকে মোটামুটি তিরিশ দিন ধরে নিয়ে সেই সময়টার নাম দেওয়া হল এক মাস।'

ঠাকুরমা বললেন, 'কিন্তু কোনো কোনো মাস আবার উনতিরিশ দিনেও হয়।'

দেবু হেসে বলল, 'গ্রহ-নক্ষত্র তো আর পণ্ডিতদের মরজি-মতো ঘোরে না, তাদের খুশিমতো তারা ঘোরে, পণ্ডিতদের দায় তার হিসেব রাখার। অথচ সঠিক হিসেব রাখা মুশকিল, তাই পৃথিবীর তিনশ পঁয়ষট্টি, চন্দ্রের তিনশ ষাট, গ্রহনক্ষত্রের সংস্থান – সবকিছুর সামঞ্জস্য রেখে পণ্ডিতেরা কোনো মাস দু-এক দিন বাড়িয়ে, কোনো মাস বা দু-এক দিন কমিয়ে গোঁজামিল দিয়ে দিচ্ছেন আর কি! তা ছাড়া আর উপায় কি?'

সত্যিই তো, উপায় আর কি? ঠাকুরমাকেও নিরুপায়তা মানতে হল।

নড়ে-চড়ে বসতে গিয়ে দেবুর হাঁটুতে লেগে স্লেটখানা গেল একটু সরে। সেখানা তুলে নিয়ে তার ওপর সে নিজের আঁকা সূর্য বুধ শুক্র আর পৃথিবীর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর পৃথিবীর একটু দূরে গোল করে আর-একটা গ্রহ এঁকে বলল, 'সৌরজগতে পৃথিবীর পরে হল মঙ্গল।'

ঠাকুরমা বললেন, 'তা হলে আমাদের সবচেয়ে কাছের গেরহো হচ্ছে একদিকে শুক্কুর, আর একদিকে মোঙ্গল।'



মঙ্গলগ্রহের বিভিন্ন অবস্থা

'শুক্রের কথা তো তোমায় বলেছি।' দেবু বলল, 'এবার মঙ্গলের পালা।'

ঠাকুরমা প্রস্তুত হয়ে বললেন, 'বেশ বল।'

দেবু শুরু করল, 'মঙ্গল যে-পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে সেটা কিন্তু ঠিক গোল নয়, সে পথ হচ্ছে চ্যাপ্টা-গোল। কাজেই ঘুরতে ঘুরতে মঙ্গল কখনও সূর্যের থেকে দূরে চলে যায়, কখনও তার কাছে চলে আসে। মঙ্গল যখন সূর্যের খুব কাছে আসে তখন সূর্যের আর তার মাঝে ফারাক হল বারো কোটি সত্তর লক্ষ মাইল, আর সূর্য থেকে খুব দূরে যখন চলে যায়,

তখন একটা থেকে আর একটা থাকে পনেরো কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে।'

'বাব্বাঃ!' ঠাকুরমা বললেন, 'সুয্যিদেবের রাজ্যিতে যে কথায় কথায় কোটি মাইল, দাদু!'



মঙ্গলগ্রহ

'আজ্ঞে হ্যাঁ', দেব বলল, 'তা হলেই ভেবে দেখ কাণ্ডখানা কি প্রকাণ্ড।'

একটু থেমে সে বলল, 'মঙ্গলগ্রহের রঙটা ভারি সুন্দর লাল রঙ।'

ঠাকুরমা উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'রাতের বেলা তা হলে আকাশে খুঁজে দেখতে হবে তো। লালরঙের তারা যেটা সেটাই তো মোঙ্গল।'

দেবু হেসে বলল, 'তা হলেই হয়েছে। আকাশে তো আরো কত লালরঙের তারা আছে। মঙ্গলগ্রহ তো সব সময় কাছে থাকে না, সব সময় রাতের আকাশেও থাকে না। পাঁজিতে লেখা থাকে মঙ্গল কখন আকাশের কোনখানে থাকবে, সেই হিসেবে মঙ্গলকে দেখতে হয়।'

ঠাকরমা হতাশ হলেন।

দেবু বলল, 'মঙ্গল কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে ঢের ছোট পৃথিবীর সাতভাগের একভাগ মোটে। মঙ্গলের বেড় হচ্ছে মোটে চার হাজার দুশো মাইল। মঙ্গলের উপগ্রহ হল দুটো। হল্ নামে এক মস্তবড় জ্যোতির্বী পণ্ডিত সে-দুটোর নাম রেখেছেন ডীমস্ আর ফোবাস্।'

'মোঙ্গলগেরোর লোকদের তো তা হলে ভারি মজা, জোচ্ছনা-রাতে তাদের বোধ হয় ঘরের ভেতর আর আলো জ্বালতে হয় না।' বলেই থমকে গিয়ে ঠাকুরমা প্রশ্ন করলেন, 'মোঙ্গলে কি মানুষ থাকে?'

দেবু বলল, 'পৃথিবীর পণ্ডিতেরা দূরবীন দিয়ে দেখে দেখে মঙ্গলের সম্বন্ধে অনেক কিছুই অনুমান করেছেন। মঙ্গলগ্রহে যে বাতাস আছে তাতেও পৃথিবীর মতো বাষ্প হয়, মেঘ জমে

ভেসে বেড়ায়। মঙ্গলের যে উত্তরমেরু সেখানটা বরফে ঢাকা আর দক্ষিণমেরুতে আছে সমুদ্র। দূরবীন দিয়ে দেখা গেছে, সেই সমুদ্র থেকে অনেকগুলো সোজা সোজা প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা খাল চলে গেছে উত্তরদিকে। অমন সোজা খাল তো আপনা-আপনি তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। তাতে মনে হয়, মঙ্গলেও পৃথিবীর মানুষের মতো বুদ্ধিমান জীব বাস করে—নিজেদের সুবিধার জন্যে খাল কাটবার বুদ্ধি যাদের আছে। অবশ্য তাদের নাম নিশ্চয়ই 'মানুষ' নয়। পণ্ডিতদের এ অনুমান হয়তো সত্যি না-ও হতে পারে। তবে মঙ্গল সম্বন্ধে জানবার জন্যে পৃথিবীর পণ্ডিতেরা যেরকম চেষ্টা করছেন তাতে শীঘ্রই হয়তো তার সব রহস্য আমাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে।'

ঠাকুরমা চুপ করে হয়তো মনে মনে সেই শুভদিনের আগমন কামনা করতে লাগলেন।

দেবু বলল, 'শুনলে অবাক হবে, ঠাম্‌মা, দুঃসাহসী মানুষ এমন আশাও করছে যে, একদিন হয়তো তারা আকাশের পথে মঙ্গলে বেড়াতে যেতে পারবে।'

তাঁর দিকে স্বপ্নাতুর দৃষ্টিতে কতক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ হাসি-মুখ করে সে বলল, 'কিন্তু ততদিন কি তুমি বেঁচে থাকবে ঠাম্‌মা?'

ততদিন বেঁচে থাকা অবশ্য তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু এমন-সব বিচিত্র তথ্য শোনাবার জন্যে দেবুর মতো একটি নাতি থাকলে কোন্ ঠাকুরমার মরতে সাধ যায়?

স্লেটের ওপর পেনসিলের ডগা-ঠোকার ঠুক্‌ঠুক্‌ আওয়াজ উঠল। ঠাকুরমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও আবার কি আঁকছ সব ?'

দেবু গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, 'মঙ্গলগ্রহের পরে অনেকখানি ফাঁক। সেখানে ছড়িয়ে আছে অতি ছোট ছোট অনেকগুলো নক্ষত্র—এত ছোট সেগুলো যে খালি চোখে দেখতেই পাওয়া যায় না।'

ঠাকুরমা বললেন, 'সেই দূরবীন দিয়ে ?'

দেবু বলল, 'হ্যাঁ, দূরবীন দিয়ে খুব ভালো করে দেখলে তবে দেখা যায়। একসঙ্গে এসব খুদে তারাকে বলা হয় গ্রহাণুপুঞ্জ।'

ঠাকুরমার মুখে শব্দটা উচ্চারণের চেষ্টার নীরব কম্পন দেখে দেবু হো-হো করে হেসে উঠল, বলল, 'থাক্‌, গ্রহাণুপুঞ্জ আর তোমার মুখে ফুটবে না, গ্রহই তোমার মুখে গেরো।'

ঠাকুরমা দন্তহীন মুখে ফ্যাক্‌-ফ্যাক্‌ করে হাসতে লাগলেন।

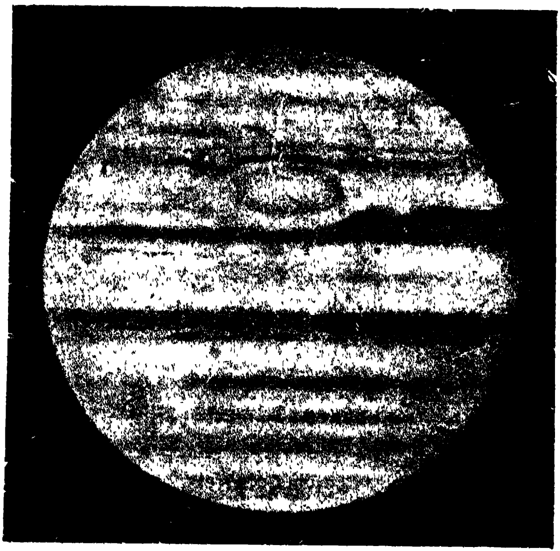
গ্রহাণুপুঞ্জের পরে খানিক দূরে বড় একটা গোলক এঁকে দেবু বলল, 'ইনি হলেন বৃহস্পতি।'

'দেবগুরু বেরোস্‌পতি।' ঠাকুরমা বিশেষণ লাগালেন।

'প্রাচীন পণ্ডিতেরা সাধে কি আর এঁকে এত বড় মান দিয়েছেন ?' দেবু বলল, 'গ্রহদের রাজ্যে বৃহস্পতি হল সব চেয়ে বড় গ্রহ। কত বড় জান ?—সৌরজগতের বাকি সবগুলো গ্রহ একসঙ্গে যত বড়, বৃহস্পতির আকার তার চেয়েও বড।'

বিস্ময়ে ঠাকুরমা একটা হাঁ করলেন মাত্র।

দেবু বলল, 'তেরো-শ পৃথিবী একত্র করলে যত বড় হয় বৃহস্পতির আকার হল ততখানি। রেগে গিয়ে বৃহস্পতিকে তুমি যদি শূলে দিতে চাও, তাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করবার জন্যে পঁচাশি হাজার মাইল লম্বা একটি শূল দরকার হবে।'



বৃহস্পতি

ঠাকুরমা হেসে বললেন, 'কাজ নেই, ভায়া, বেরোস্‌পতিকে শূলে বিঁধে।'

দেবু বলল, 'সূর্য থেকে বৃহস্পতি আছে আটচল্লিশ কোটি কুড়ি লক্ষ মাইল দূরে। এর ক'টা উপগ্রহ বল দেখি?'

ঠাকুরমার কি সে কথা মনে আছে? হাসিমুখে তিনি চোখ বুজে ভাববার ভান করলেন।

'কিচ্ছু যদি তোমার মনে থাকে!' দেবু বলল, 'বৃহস্পতির ন'টা উপগ্রহ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ', ঠাকুরমার মনে পড়ল, 'ন'টা চাঁদ।'

'চাঁদের আলোয় আলোয় রাতের বেলা একেবারে ভুমুল রোশনাই আর কি!' বলতে বলতে বৃহস্পতি থেকে বেশ একটু দূরে দেবু আর-একটা গ্রহ এঁকে বলল, 'ইনি হচ্ছেন শনিগ্রহ।'

নাম শুনেই ভীতিভক্তিতে ঠাকুরমার মুখটা লম্বা হয়ে উঠল।

সেই গোল গ্রহকে ঘিরে দেবু তিনটা চক্র আঁকল।

ঠাকুরমা মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন, 'ও কি? শনিচক্কোর?'

'হ্যাঁ, শনিকে ঘিরে আছে তিনটে অতি উজ্জ্বল চওড়া আলোর রেখা। দূরবীন দিয়ে দেখতে তাই শনিকে ভারি সুন্দর দেখায়। এই আলোকরেখা তিনটেকে বলা হয় শনির বলয় অথবা বেষ্টনী।'

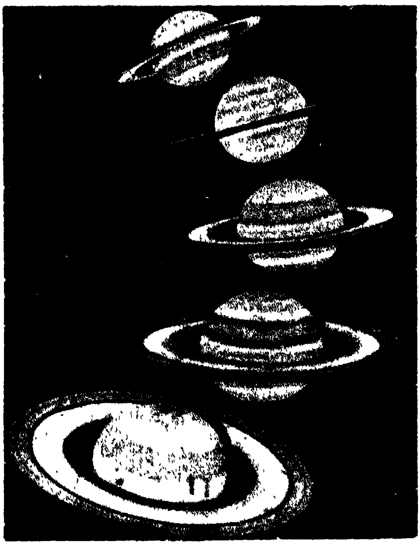
'বে-ষ-ট-নী।'—শক্ত কথাটা অল্প চেষ্টাতেই ঠাকুরমা বলতে পারলেন দেখে দেবু আনন্দিত হল। সে উৎসাহিত হয়ে বলল, 'চেষ্টা করলে সবই ভালো করে বলতে পারবে, পৃথিবী, সূর্য, বৃহস্পতি, গ্রহাণুপুঞ্জ— একটু চেষ্টা করলেই পারবে বলতে।'

নিজের প্রশংসায় একটু লজ্জা বোধ করেই যেন ঠাকুরমা

কথার মোড়টা আসল ব্যাপারের দিকে ফিরিয়ে দিলেন, 'সুয্যি থেকে শনি আছেন কত দূরে?'

দেবু বলল, 'সূর্য থেকে---সূর্য, বুঝলে? সুয্যি নয়। সূর্য থেকে শনি আছে অষ্টাশি কোটি সাতষট্টি লক্ষ উনাশি হাজার নয়-শ মাইল দূরে।'

অনবরত লক্ষ কোটি মাইল শুনে শুনে ঠাকুরমার কান:



শনিগ্রহের বিভিন্ন ছবি

দোরস্ত হয়ে গেছে, এবার আর বিস্ময়ের কোন ভঙ্গি না করে তিনি শুধু চেয়ে রইলেন।

দেবু বলল, 'পৃথিবীর চেয়ে আকারে শনি সাত-শ চল্লিশ গুণ বড়।'

ঠাকুরমা বললেন, 'শনির চাঁদ যেন ক'টা?'

'নিজের বুঝি মনে নেই?' দেবু হেসে বলল, 'শনিরও উপগ্রহ আছে ন'টা।'

পাশের ঘর থেকে গম্ভীর গলায় একটা কাশির আওয়াজ আসতেই দেবু চকিত হয়ে উঠল, 'বাবার ঘুম ভেঙেছে!'

ঠাকুরমা বললেন, 'তাতে কি হয়েছে? তুমি বল-না, বাবা এসে নিজেই শুনে বুঝুক-না কত বিদ্যে হয়েছে তাঁর দেবুর।'

দেবু ভয়ে ভয়ে বলল, 'বাবা যে দুপুরবেলা অঙ্ক কষতে বলেছিলেন।'

'বললেই বা।' ঠাকুরমা বললেন, 'অঙ্ক কষার চেয়ে কি এমন খারাপ কাজটা করা হয়েছে? সে আমি বলব'খন তাকে, তোমার কোনো ভয় নেই। বল, দাদু, তারপর আর কি গ্রোহো আছে?'

দেবু হেসে উঠল, 'শুদ্ধ করে বললে বুঝি? তা অনেকটা হয়েছে বটে, গ্রোহো নয়—গ্রহ, বুঝলে? হ্যাঁ, তারপরের গ্রহ হল ইউরেনস্।'

শনি থেকে বেশ একটু দূরে একটি গোলক আঁকল সে, বলল, 'এই হল ইউরেনস্।'

তার থেকে আরো দূরে আর একটি গোলক এঁকে বলল, 'তার পরে এই হল নেপচুন।'

নেপচুন থেকে আরো দূরে আর একটি গ্রহ বসিয়ে বলল, 'তারপরে এই হল প্লুটো।'

ঠাকুরমা বললেন, 'সবগুলোর কথা একসঙ্গে বলছ কেন? একটা একটা করে বল।'

দেবু বলল, 'এ তিনটে গ্রহ সম্বন্ধে বলবার নেই যে কিছু। এগুলো পৃথিবী থেকে এত বেশি দূরে যে, খুব জোরালো দূরবীন ছাড়া দেখতেই পাওয়া যায় না, এগুলো সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত ভালো করে কিছু জানা যায় নি। প্লুটোই সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরের গ্রহ, তার চেয়ে দূরে এখন পর্যন্ত আর কিছু দেখতে পাওয়া যায় নি। যতদূর জানা গেছে, পৃথিবীর চেয়ে প্লুটো আকারে কিছু ছোট।'

হঠাৎ বাইরে থেকে দরজাটা এক ঠেলায় খুলে ফেলে ঘরের ভেতর মুখ বাড়িয়ে দিয়ে বড়দা বললেন, 'কি ভড়র্ ভড়র্ চলছে সারাদুপুর ঠাকুমাতে আর আদুরে নাতিতে?'

ঠাকুরমা বললেন, 'তোমরা তো, ভাই, এত এত বিদ্যে শিখেছ, বুড়ো বোকা ঠাকুমাকে তো কই একটি আখর শেখাতে দেখলাম না কোনো দিন। দেখে যাও দিকি দেবু আমায় কত কথা শিখিয়েছে!'

দেবু গোপনে ঠাকুরমার গা টিপতে লাগল।

বড়দা 'বেশ তো বেশ' বলে হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

দেবু বলল, 'কেন তুমি আমার গুণ গাইতে যাও, ঠাম্মা, ওরা শুধু টিট্‌কিরি দেবে বই তো নয়?'

'এ্যাঃ!' ঠাকুরমা মুখ ভেংচিয়ে বললেন, 'বিদ্যে শিখলে

টিটকিরি দেবে! দিক্ না, আমি আচ্ছা করে শুনিয়ে দেব। দেখব আমি এবার থেকে পড়ার জন্যে আমার দেবুর গায়ে কে হাত তোলে!'

বাইরে দুপুর গড়িয়ে বিকেলের হাওয়া দিয়েছে। দেবুর মনটা আনচান করে উঠল। ক্ষেত্রটা আজ উর্বর। দেবু সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ভুলল না, বলল, 'ঠাম্মা, আজ একটা কাঁচা-মিঠে আম খাব।'

ঠাকুরমা আপত্তি করলেন না, হেসে বললেন, 'যাও, উঁচু ডালে উঠো না, আর, একটার বেশি নয় কিন্তু।'

অত কথা শোনবার কি আর তর সয়? দেবু ততক্ষণে ছুরি-হাতে কাঁচা-মিঠে আমগাছের মগডালে।

*

সন্ধ্যার একটু পরেই পুব-আকাশে রাঙা আলো ছড়িয়ে কৃষ্ণ-পক্ষের প্রতিপদের চাঁদ উঠল। দেবু তখন বারান্দায় মাদুর পেতে আলোর সামনে বইপত্র খুলে পড়তে বসেছে। ঠাকুরমা নিত্যকার মতো এক কোণটিতে আহ্নিকে বসেছেন।

চাঁদের দিকে চেয়ে দেবু বলল, 'আজকের চাঁদকেও হঠাৎ দেখে গত কালকের পূর্ণিমার চাঁদের মতোই মনে হচ্ছে। আসলে কিন্তু কালকের চেয়ে চাঁদ আজ একটুখানি ছোট হয়ে গেছে।'

ঠাকুরমা তখনও আহ্নিক শুরু করেন নি, বললেন, 'হ্যাঁ, আজকের চাঁদ কালকের চেয়ে এক কলা ছোট। তা, আমার

আহ্নিক সেরে তোমার কাছে চাঁদের গল্প শুনব, দাদু, ততক্ষণ তুমি পড়াটা সেরে নাও।'

সন্ধেবেলাটাতে অবশ্য গল্প করার সুবিধে, বাবা যান রায়েদের বাড়ির মজলিশে, দাদার এবার বি-এ পরীক্ষা, রোজ সন্ধেবেলা তিনি পাশের গাঁয়ে যে অধ্যাপক আছেন, তাঁর কাছে যান পড়াশুনো করতে; মা তো থাকেন রান্নাঘরেই। কিন্তু পড়াশোনা না সেরে তো আর গল্প করা যাবে না। এক আশা, দাদা তো ফেরেন অনেক রাত করে; ছুটির দিনে বাবারও মজলিশ ভাঙে অনেক রাতে।

... ...

যথাকালে দেবুর যখন পড়া শেষ হল, দেখা গেল, ঠাকুরমারও ততক্ষণে আহ্নিক সমাধা হয়ে গেছে। মা গেছেন খোকাকে ঘুম পাড়াতে। আর এখন গল্প করলে কেউই কিছু বলবেন না, তবু দাদাটা মিছিমিছি সব সময় তাকে ঠাট্টা করে, আর বাবাকে দেখলেই দেবুর কেমন যেন গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। অঙ্ককষা দেবুর ভারি অপছন্দ, অথচ বাবা তাকে দেখলেই অঙ্কের কথা জিজ্ঞাসা করবেন, অঙ্ক ছাড়া আর সব বিষয়ে যে দেবু ভালো সে-কথাটি একবারও বলবেন না। মা খুব ভালো, হাজার দোষে হাজার রাগ হলেও মারধরের নামটি কক্ষনো করেন না।

দেবু বলল, 'চাঁদ রোজ রোজ একটু একটু করে বাড়ে-কমে কেন, বল দেখি, ঠাম্‌মা?'

ঠাকুরমা বললেন, 'চাঁদের কথা তো তুমি আমায় বল নি, দাদু।'

'কিচ্ছুই কি বলি নি ?' দেবু জিজ্ঞাসা করল।

ঠাকুরমা বললেন, 'হ্যাঁ, চাঁদ হচ্ছে উপগ্রেহো।'

দেবু বলল, 'হ্যাঁ, চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ, পৃথিবীর চারদিকে সে ঘুরে বেড়ায়। চন্দ্র একেবারে বল-এর মতো গোল, পৃথিবী থেকে সে আছে দু'লক্ষ আটত্রিশ হাজার মাইল দূরে।'

ঠাকুরমা প্রশ্ন করলেন, 'চাঁদ তো পিথিবির চেয়ে ছোট ?'

'হ্যাঁ ছোট।' দেবু বলল, 'চন্দ্রকে এফোঁড়-ওফোঁড় করতে হলে মাত্র দু'হাজার এক-শ ষাট মাইল লম্বা একটা শূলের দরকার।'

ঠাকুরমা হেসে বললেন, 'চাঁদকে হাতে পেলে শূলে দিতাম, দাদু; আলো দিচ্ছিস তো বেশ বাপু, রোজই রাত্তিরে পুন্নিমের আলো দে। তা নয় আবার অমাবস্যে করে লোককে অন্ধকারে দুঃখু দেওয়া কেন ?'

'চাঁদ-ব্যাচারি কি করবে বল,' দেবু বলল, 'তার তো নিজের কোনো আলো নেই। সূর্যের আলো পড়ে চন্দ্রের গায়ে, চন্দ্রের থেকে সে আলো আবার ঠিকরে পড়ে পৃথিবীতে। চন্দ্র তো পৃথিবীকে অবিরত প্রদক্ষিণ করছে, চন্দ্রের আধখানাই সবসময় পৃথিবীর দিকে থাকে।...চন্দ্রের ফোটো দেখবে, ঠাম্‌মা ?'

'চন্দ্রের ফোটো !'

'হ্যাঁ', দেবু বলল, 'পৃথিবী থেকে দূরবীন দিয়ে চাঁদকে যেমন দেখায় তার ছবি আর-কি! দেখবে?' বলে তাঁর সম্মতির অপেক্ষা না করেই সে নিজের বই খুলে চাঁদের ফোটো দেখাল। বলল, 'দেখ চন্দ্রের গায়ে অনেক পাহাড়-পর্বত গর্ত সমতল জায়গা রয়েছে।'

ঠাকুরমা অবাক দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইলেন। চাঁদ তা হলে সত্যি সত্যি দেবতা নয়! দেবতা তো নয়ই। চাঁদ হচ্ছে উপগ্রহ। কিন্তু লাখো লাখো মাইল দূরের সেই চন্দ্রের ফোটো নিয়েছে মানুষ। মানুষ কি না করতে পারে!

দেবু বলল, 'চাঁদের কলঙ্ক কাকে বলে জান?'

তিনি যা জানেন সে-সবই যে মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে, কাজেই তাঁর জানা সেই চাঁদের বুড়ির গল্প বললে লাভের মধ্যে তা শুনে দেবু হেসে উঠবে। তিনি চুপ করে রইলেন।

দেবু বলল, 'চাঁদে যে-সব উঁচু পাহাড়-পর্বত আছে সে-সবের তো ছায়া পড়ে, সেই ছায়া এখান থেকে কালো কালো দাগের মতো দেখায়, আর যে-সব নিচু জায়গা আছে সেখানে সূর্যের আলো ঢুকতে পায় না বলে কালো দেখায়। তাকেই বলা হয় চাঁদের কলঙ্ক।'

ঠাকুরমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'চাঁদে মানুষজন আছে?'

'না, তা নেই।' দেবু বলল, 'চাঁদে জলও নেই, বাতাসও নেই, সেখানকার মাটি মরুভূমির মতো নীরস। কাজেই সেখানে



চন্দ্রের ফোটো।

তরিতরকারি-গাছগাছড়াও জন্মায় না, কোনো প্রাণীও থাকতে পারে না।'

বই বন্ধ করে রেখে দিয়ে দেবু তার শ্লেট টেনে নিয়ে তাতে একদিকে আঁকল সূর্য, তার কিছু নিচে আঁকল পৃথিবী, তার খানিক নিচে আঁকল চন্দ্র। পৃথিবীর চারদিক ঘিরে গোলাকার করে চন্দ্রের ভ্রমণের পথ আঁকল। বলল, 'এখন, দেখ, পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারদিকে, আর চন্দ্র ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে, দুই কিন্তু সমান তালে ঘুরছে না। ঘুরতে ঘুরতে তিনটে যখন এক লাইনে এল—সূর্য রইল একদিকে, চন্দ্র আর-এক দিকে, মাঝখানে রইল পৃথিবী তখন সূর্যের আলো পড়ল চন্দ্রের এদিককার আধখানার সবটা জুড়ে; পৃথিবী থেকে আমরা গোল সেই সবটুকু দেখতে পেলাম সবটুকুরই আলো পেলাম, তখনই হল আমাদের পূর্ণিমা।'

'ভারি মজা তো!' ঠাকুরমা পুলকিত হলেন।

পূর্ণিমার চন্দ্র থেকে এক পাশের দিকে আর একটা চাঁদ এঁকে দেবু বলল, 'চন্দ্র যখন এখানে এল তখন তো সব-আধখানা জুড়েই সে সূর্যের আলো পাচ্ছে না।'

ঠাকুরমা দেখে এবং ধারণা করে বললেন, 'না, তা তো পাচ্ছে না।'

দেবু বলল, 'চন্দ্রের যতখানি এখন সূর্যের আলো পাচ্ছে আমরাও ততখানিই দেখতে পাচ্ছি আর তারই আলো পাচ্ছি।

চাঁদের যেটুকু আলো পাচ্ছে না, সেটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমরা বলি চাঁদের এতটুকু কমে গেল।'

'এমনি করেই তা হলে দিনে দিনে চাঁদের ক্ষয় হয়!' ঠাকুরমা বললেন।

দেবু এবার চন্দ্রের ভ্রমণপথের ওপর, সূর্য আর পৃথিবীর মাঝখানে চাঁদ আঁকল সূর্য চাঁদ আর পৃথিবীকে এক রেখায় রেখে। বলল, 'ঘুরতে ঘুরতে চন্দ্র যখন এখানে এল, তখন তার কোন্ অংশ সূর্যের আলো পাচ্ছে?'

ঠাকুরমা বললেন, 'পৃথিবীর উলটো দিকে চাঁদের যে অর্দ্ধেক রয়েছে তাতেই সূর্যের আলো পড়ছে।'

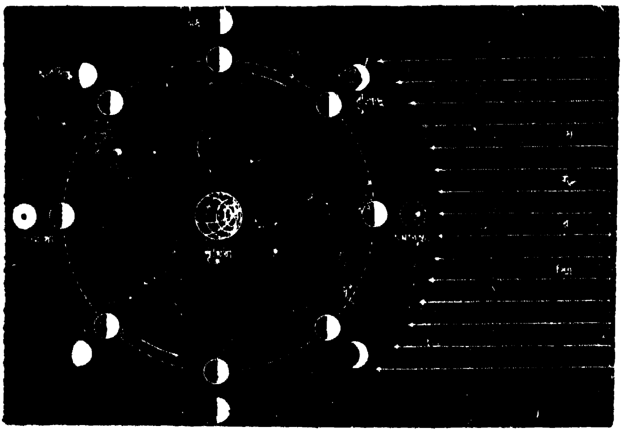
দেবু বললে, 'পৃথিবীর দিকে চন্দ্রের যেদিক সেখানে একটুও সূর্যের আলো পড়ছে না। সেদিক সম্পূর্ণ অন্ধকার, কাজেই পৃথিবীও চাঁদের অন্ধকারই পাচ্ছে তখন। একেই বলে অমাবস্যা।'

কৌতূহলে ঠাকুরমা শিশুর মতো চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

কালো চাঁদের একটু দূরে আর একটি চন্দ্র এঁকে দেবু বলল, 'এবার চাঁদ একটুখানি জায়গায় সূর্যের আলো পাচ্ছে সেটুকুই আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার আলো পাচ্ছি। একেই বলে দিনে দিনে চন্দ্রের বাড়। এমনি করেই চন্দ্র বাড়ে আর কমে, এক-একদিন যতটুকু বাড়ে বা কমে তাকে বলা হয় এক কলা। এক কলা-এক কলা করে বেড়ে বেড়ে পনেরো দিনে চন্দ্র সবখানি

বড় হয়, তখন হয় পূর্ণিমা। আবার এক কলা করে করে কমে কমে চন্দ্রের যখন কিছুই আর দেখতে পাওয়া যায় না তখন হল অমাবস্যা।'

ঠাকুরমা আকাশের চাঁদের দিকে নীরবে চেয়ে রইলেন আর



চন্দ্রের ক্ষয়-বৃদ্ধি

দেবু চেয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে। কতক্ষণ পরে দেবু বলল, 'আচ্ছা, ঠাকুমা, পৃথিবীটা তো কাঁচের বা সেরকম কোনো জিনিসের তৈরি নয় যে তা ভেদ করে আলো অপরদিকে পেরিয়ে যাবে।'

ঠাকুরমা বললেন, 'তা তো নয়ই।'

দেবু বলল, 'তা হলেই পৃথিবীর একদিকে যখন আলো পড়ে তার উলটোদিকে তখন পৃথিবীর ছায়া পড়ে।'

'তা তো পড়েই।' ঠাকুরমা স্বীকার করলেন।

'বেশ।' দেবু বলল, 'তা হলে পূর্ণিমার দিনে সূর্য, পৃথিবী আর চন্দ্র যখন সোজাসুজি রয়েছে—পৃথিবী রয়েছে মাঝখানে, তখন পৃথিবীতেও সূর্যের আলো পড়ছে।'

'তা পড়ছে।'

'পৃথিবীর বিপরীত দিকে চাঁদের ওপর তো তখন পৃথিবীর ছায়া পড়বে, তখন সে ব্যাচারি আর সূর্যের আলো পাচ্ছে কি করে?'

ঠাকুরমা খানিক হাঁ করে থেকে বললেন, 'এরকম কি হয়?'

'হয় বই কি।' দেবু বলল, 'এরকম যখন পূর্ণিমার দিনে চাঁদের ওপর পৃথিবীর ছায়া পড়ে তখন বলা হয় -গ্রহণ হয়েছে চন্দ্রগ্রহণ।'

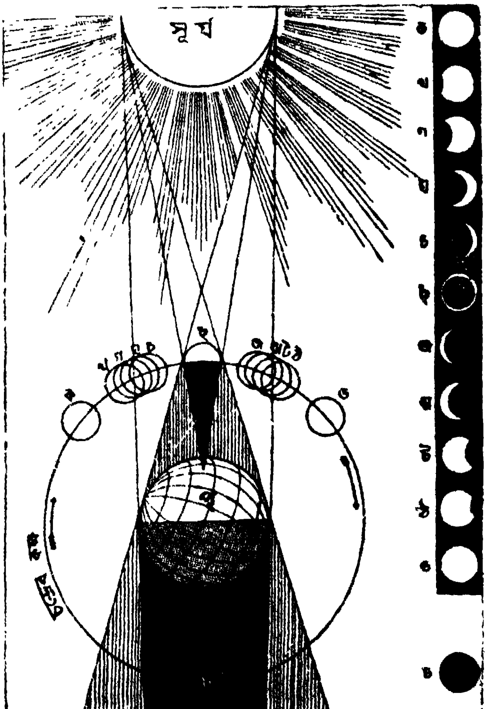
বিস্ময়কণ্ঠে ঠাকুরমা বললেন, 'তাকেই বলা হয় গেরোন্?'

দেবু হাসিমুখে মাথা নেড়ে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তাকেই বলা হয় চন্দ্র-গ্রহণ, গেরোন নয়।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ঠাকুরমা বললেন, 'তা হলে তো সব পূর্ণিমাতেই চন্দোগ্‌গেরোন হবে।'

দেবু উৎসাহিতভাবে বলল, 'এই কথাটাই তোমার মুখ থেকে শুনতে চেয়েছিলাম।...হ্যাঁ, এরকম হলে প্রত্যেক পূর্ণিমাতেই চন্দ্রগ্রহণ হবে। কিন্তু পৃথিবী যে-পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, আর চন্দ্র যে-পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এ-দুটো গোল

পথ এক সমতলে নয়, দুটো পথই ঢালুভাবে রয়েছে, তাই দুটো পথে হয়েছে কাটাকাটি। কাটাকাটির একদিককার বিন্দুকে বলে রাহু, আর একদিককার বিন্দুকে বলে কেতু। চন্দ্র যেদিন



গ্রহণ

রাহু অথবা কেতুর ওপর বা কাছাকাছি আসে সেদিন যদি পূর্ণিমা হয়, তবে সেদিনই গ্রহণ হবে ; অন্য পূর্ণিমায় হবে না।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' ঠাকুরমা বলে উঠলেন, 'শাস্তরে লিখেছে চাঁদকে রাহুতে গেরাস করে, তবে তাকে গেরোন বলে।'

দেবু হাসতে হাসতে বলল, 'সত্যি-সত্যিই কিন্তু রাহু নামে একটা প্রকাণ্ড দৈত্য হাঁ করে চন্দ্রকে রসগোল্লার মতো টপ করে গিলে ফেলে না।'

ঠাকুরমা হাসতে লাগলেন। খানিক পরে বললেন, 'সুয্যিগ্গেরোন হয় কি করে?'

দেবু বলল, 'অমাবস্যার দিনে চন্দ্র তো থাকে সূর্য আর পৃথিবীর মাঝখানে। তিনটে এক রেখায় এলে চন্দ্র মাঝখানে কালো ছায়ার মতো দাঁড়ায়, কাজেই সূর্যকে পৃথিবী থেকে দেখতে পাওয়া যায় না। এরই নাম হল সূর্যগ্রহণ।'

ঠাকুরমা বললেন, 'সব অমাবস্যেতে সুয্যিগ্গেরোন হয় না বুঝি ওই সেই-'

'হ্যাঁ ওই সেই রাহু-কেতুর কাণ্ড। তোমাদের শাস্তরে তো আছে- সূর্যগ্রহণে কেতু এসে সূর্য-ব্যাচারাকে খ্যাঁক্ করে গিলে ফেলে।' দেবু বলল, 'রাহু কেতুর নাম কিন্তু শাস্তরে ঠিক আছে।'

ঠাকুরমা নীরব গম্ভীর দৃষ্টিতে সামনের জ্যোৎস্না-আকাশের পানে চেয়ে আছেন দেখে দেবু জিজ্ঞাসা করল, 'কি ভাবছ, ঠাকুমা?'

'ভাবছি, দাদু', ঠাকুরমা বললেন, 'আবার যদি এখন সেই

ছোটবেলাটা ফিরে পাওয়া যেত তবে তোমার ছোট্ট বোনটি হয়ে এসব কত জ্ঞানের কথা তোমার কাছে শিখে নিতাম; আমাদের ছোটবেলা তো কেউ আমাদের এসব শেখায় নি।'

ঠাকুরমার দুঃখ দেবু অনুভব করল, সে সহানুভূতির কণ্ঠে বলল, 'তাতে কি হয়েছে, ঠাকুমা, আমি এখন তোমায় সব শেখাব।'

ঠাকুরমা সস্নেহে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন

হঠাৎ আকাশের ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত অতি দীর্ঘ সরু একটা আলোকরেখা কেটে ছোট্ট একটা উজ্জ্বল পদার্থ অতি দ্রুতবেগে শোঁ-ৎ করে ছুটে গিয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। তা দেখে ঠাকুরমা আঁতকে বলে উঠলেন, 'রাম রাম রাম।'

'কি হল, ঠাকুমা!' দেবু জিজ্ঞাসা করল।

ঠাকুরমা বললেন, 'একটা তারাপাত হল, দাদু।'

'তারাপাত মানে?'

'তোমাদের বইপত্তরে তার কি মানে, তা তো জানিনে, ভাই,' তিনি বললেন, 'আমরা তো জানি, পুণ্যিবান লোকেরা মারা যাবার পর স্বগ্‌গে গিয়ে তারা হয়ে থাকেন।'

'স্বর্গ বুঝি ওই আকাশটা?' দেবু বলল।

ঠাকুরমা বললেন, 'হ্যাঁ। তা সেই স্বগ্‌গে থেকে তারা যদি খুব পাপকাজ করেন তা হলে ভগবান তাঁদের আর স্বগ্‌গে

থাকতে দেন না—সেখান থেকে ছুঁড়ে একেবারে নিচেকার পিথিমির মাটিতে আছড়ে ফেলেন।'

দেবু মুচকি হাসতে লাগল।

ঠাকুরমা বললেন, 'এরকম পাপীকে দেখলেও পাপ হয়; তাই তারাপাত দেখলে রামনাম কি ঠাকুরদেবতার নাম করতে হয়।'

দেবু হো-হো করে হেসে উঠল। ঠাকুরমাও নীরব-হাসিতে সে-সঙ্গে যোগ দিলেন; তিনি জানতেন দেবু হাসবে। সে বলল, 'আসলে ব্যাপারটা কি, শুনবে?'

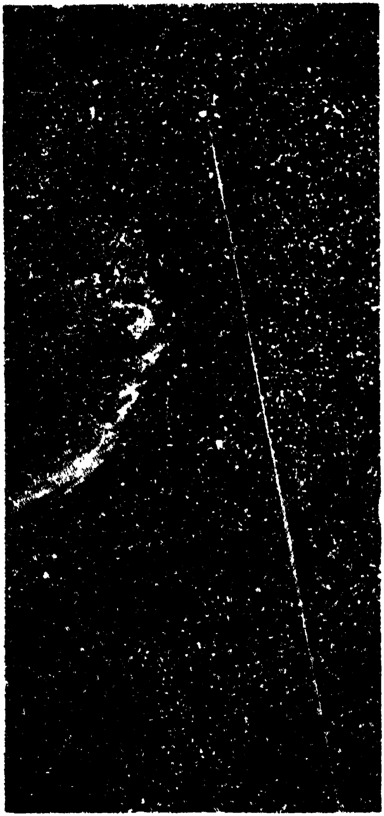
ঠাকুরমা তো শুনতেই চান।

দেবু বলল, 'আকাশে অনেক গ্রহে আগ্নেয় পর্বত আছে।'

দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং কান খাড়া করে ঠাকুরমা বললেন, 'কি আছে?'

'আগ্নেয় পর্বত—মানে আগুনে-পাহাড় আর-কি!' দেবু ব্যাখ্যা করে দিল, 'একরকম পর্বত আছে, তার ওপরকার খোলা মুখ দিয়ে সময় সময় ভেতরদিক থেকে খুব গরম গলে-যাওয়া নানা রকমের ধাতু, পাথরের পিণ্ড এসব খুব জোরে ওপরপানে ছুটে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর যে উপগ্রহ চাঁদ, দূরবীন দিয়ে দেখা গেছে তাতেও এরকম অনেক পর্বত ছিল। আগুন বর্ষণ করে করে সে-সব এখন নিভে গেছে, শুধু পাহাড়-গুলোর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মুখগুলো এখনও হাঁ করে আছে।'

ঠাকুরমাকে একটু বুঝে নেবার অবকাশ দিয়ে সে বলল, 'আকাশে অনেক গ্রহ-উপগ্রহে সেরকম আগুনে-পাহাড় আছে। সেগুলো থেকে ছোট-বড় পিণ্ড ছুটে বেরিয়ে আসে। সেই ছোটার বেগে এক-একটা পিণ্ড পৃথিবীর আকর্ষণের সীমায় এসে পড়ে, আর পৃথিবী তাকে নিজের দিকে টানতে থাকে। পৃথিবীর বাতাসের ছোঁয়ায় এসে সেই পিণ্ড জ্বলে ওঠে, আর সেই জ্বলন্ত অবস্থায় ছুটে এসে পৃথিবীর মাটিতে পড়ে। কোনো-কোনোটা আবার মাঝপথেই জ্বলে শেষ হয়ে যায়। সেই



উল্কাপাত

ব্যাপারকেই তারাপাত বলে ; তোমরা রামনাম জপ কর। আসলে

এর নাম হচ্ছে উল্কাপাত। জ্বলন্ত ওই পিণ্ডগুলোর নাম উল্কা।'

ঠাকুরমা বললেন, 'তোমার বিদ্যের ঠোকর খেয়ে আমার সব বিদ্যেই যে, দাদু, একেবারে মুখথুবড়ানি খাচ্ছে।'

দেবু হেসে বলল, 'ধাতুতে পাথরে ভরতি অনেক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আগুনে গোলা আকাশে বনবন্ করে ঘুরছে। অনেক সময় তা থেকেও উল্কাপিণ্ড ছিটকে বেরিয়ে আসে। উল্কা দু'রকমের হয়, —এক পাথরের আর এক ধাতুর তৈরি। ছোট ছোট উল্কা ছুটে আসবার মাঝপথেই জ্বলে শেষ হয়ে যায়, তা তো বলেছি। খুব বড় বড় পিণ্ড জ্বলতে জ্বলতে পৃথিবীর মাটিতে এসে পড়ে নিভে যায়। কোনো-কোনোটা এত জোরে আসে যে পৃথিবীর ওপর পড়ে মাটির ভেতর ঢুকে যায়।'

ঠাকরমা বললেন, 'মাটিতে পড়ে নিভে যাবার পর সেগুলো দেখতে পাওয়া যায়?'

'নিশ্চয়ই যায়।' দেবু বলল, 'আমাদের বাংলাদেশের রাজধানী যে কলকাতা-শহর, সেখানে মস্ত-বড় এক যাদুঘর আছে, তাতে অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস রাখা হয়। সেখানে উল্কাপিণ্ডের নিভে যাওয়া অনেকগুলো ছোট ছোট পাথর আছে।'

ঠাকুরমা মনে মনে সংকল্প করলেন, আবার কলকাতায় গেলে যাদুঘরে গিয়ে সেসব পাথর তিনি না দেখে ছাড়বেন না।

দেবু বলল, 'সময় সময় কত প্রকাণ্ড সব উল্কাপাত হয়, শুনলে

তুমি অবাক হয়ে যাবে। বিলাতের যাদুঘরে একটা উল্কাপিণ্ড আছে, তার ওজন প্রায় পঁচানব্বই মণ। গ্রীনল্যাণ্ড দেশে একটা উল্কা পড়েছিল, তার ওজন প্রায় এক হাজার মণ। মেক্সিকো প্রদেশে একটা উল্কার পাথর আছে, সাড়ে তেরো হাজার মণ তার ওজন। সাইবেরিয়ায় একটা উল্কা পড়েছিল; মাটিতে



সাইবেরিয়ায় পতিত বৃহৎ উল্কা

যখন পড়ল, তার চারদিকে চল্লিশ মাইল পর্যন্ত সব বাড়িঘর পুড়ে গিয়েছিল, চারশ' মাইল দূরের লোকের গায়ে তাপ লেগেছিল। ...আচ্ছা, ওরকম ওজনের একটা উল্কা যদি ছুটে এসে এখন আমাদের মাথায় পড়ে, ঠাম্মা?

ঠাকুরমা শিউরে উঠে বললেন, 'বালাই ষাট্, পড়ে তো সে একা আমার মাথায়ই পড়ুক।'

মুখ দেখে মনে হল দেবুর তাতে নিতান্তই আপত্তি আছে। সে বলল, 'ধূমকেতু থেকেও সময় সময় রাশি রাশি উল্কাপিণ্ড ছুটে আসে।'

'ধূমকেতু!' ঠাকুরমার দৃষ্টি দূর অতীতের দিকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। তিনি বললেন, 'সেই অনেক বছর আগে আকাশে ধূমকেতু দেখেছিলাম---সেই ল্যাজওয়ালা ধুমকেতু।'

দেবু বলল, 'ধূমকেতু এক অদ্ভুত জিনিস অতি উজ্জ্বল বাষ্পে গড়া। ওদের মাথার দিকটা খুব বেশি উজ্জ্বল, আর ল্যাজের দিকের আলো ক্রমেই কমে কমে মিলিয়ে গেছে। মাথায় ল্যাজে সে এক প্রকাণ্ড লম্বা ব্যাপার। ধূমকেতুর ঝাঁটার মতো সেই ল্যাজ লাখ-লাখ মাইল ছড়ানো।'

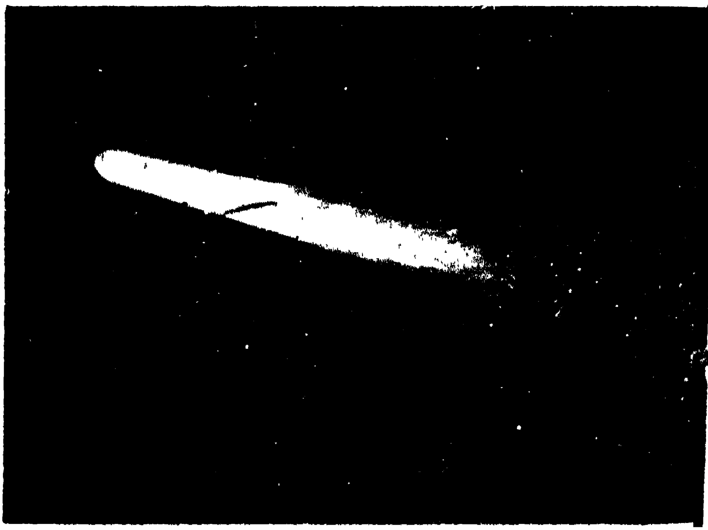
ঠাকুরমা বললেন, 'ধূমমেতু তো গেরহো নয়?'

'না, ধূমকেতু গ্রহ নয়।' দেবু বলল, 'ধূমকেতু ধূমকেতুই। কাঁচের মতো স্বচ্ছ গ্যাস্-এ বা বাষ্পে ধূমকেতু তৈরি। পাতলা একটা মেঘে ঢাকা পড়লে আকাশের একটা তারা দূরবীন দিয়েও দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু একটা ধূমকেতুর ল্যাজে একবার একটা তারা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, দূরবীন দিয়ে সে তারাটা কিন্তু বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া গেছে।'

এতক্ষণ পরে ঠাকুরমা মনে করতে পারলেন, বললেন,

'ধূমকেতু দেখেছিলাম সেই তোমার গিয়ে যে বছর তোমার বড়-পিসিমার বড়ছেলে হল, সেইবছর—সে বোধ করি—'

তাঁর বোধ করার তর সইল না দেবুর, সে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ,



হেলির ধূমকেতু

সে বোধ হয় হেলির ধূমকেতু। হেলি নামে এক সাহেব সেটা আবিষ্কার করেন। ইংরেজি ১৮৫০ সালে সেটাকে প্রথম দেখা যায়। হেলির ধূমকেতু পঁচাত্তর বছর পর-পর একবার করে পৃথিবীর কাছে আসে, তখন পৃথিবীর লোক তাকে দেখতে পায়। এরকম দু-একটা ধূমকেতু বহুকাল পরে পরে পথিবীর ভাগ্যে

এসে দেখা দেয়। বেশির ভাগ ধূমকেতুই একবার দেখা দিয়ে কোন্ দূরে যে পালিয়ে যায় তার আর কোন খোঁজই পাওয়া যায় না।'

'না-পাওয়াই ভালো।' ঠাকুরমা বললেন, 'ধূমকেতু উঠলে নাকি পিথিমির অকল্যেন হয়।'

'তা জানিনে।' বলে দেবু ধীরে সুস্থে তার বইপত্তর গুছোতে লাগল।

ঠাকুরমা হেসে বললেন, 'খিদে পেয়েছে বুঝি, দাদু?'

দেবু মৌন থেকে জানাল যে তাঁর অনুমানটা সত্য। বোধ হয় রান্নাঘরের দিকে যাওয়ার জন্যই সে উঠোনে নেমে দাঁড়াল। হঠাৎ উৎসাহে চঞ্চল হয়ে সে আবার উঠে এসে ঠাকুরমার হাত ধরে বলল, 'ঠাম্‌মা, ধ্রুবতারা দেখবে, এস।'

ঠাকুরমাকে উঠতেই হল, তাঁর নিজেরও ইচ্ছা কম নয়। উঠোনে নেমে এসে তিনি তার কাছে দাঁড়ালেন।

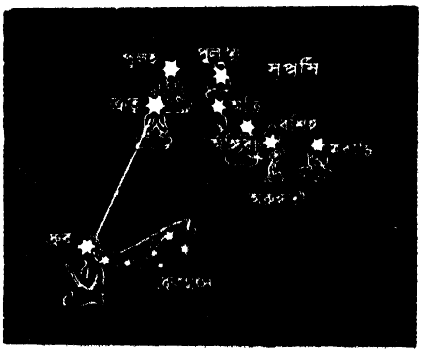
দেবু উত্তর-আকাশের দিকে দেখিয়ে বলল, 'ওই হচ্ছে সপ্তর্ষিমণ্ডল, ওই যে সাতটা নক্ষত্র রয়েছে, একটা রেখা দিয়ে যোগ করে দিলে কতকটা লাঙ্গলের মতো হবে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ', ঠাকুরমা বললেন, 'ও তো সাতজালি।'

'সাতজালি কি?' দেবু হেসে উঠল, বলল, 'ওই সাতটা নক্ষত্র মিলে হল সপ্তর্ষি। আমাদের পুরাণের গল্পে বলে, ওই সাতটি নক্ষত্রের প্রত্যেকেই এক-একজন ঋষি। তাঁদের নাম

হচ্ছে—মরীচি বশিষ্ঠ অঙ্গিরা অত্রি পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু। এখন, পুলহ থেকে ক্রতু পর্যন্ত একটা সোজা রেখা টানলাম, যতটুকু রেখা হল তার পাঁচগুণ লম্বা করে দিলাম সেটাকে সামনের দিকে ; যেখানে এসে ঠেকল সেখানে দেখ—বড় একটা নক্ষত্র জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে।'

ঠাকুরমা দেখতে পেলেন, পুলকভরে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ!'



ধ্রুব ও সপ্তর্ষি

দেবু বলল, 'ওই হচ্ছে ধ্রুবনক্ষত্র। পৃথিবীর যে মেরুদণ্ড কল্পনা করা হয় তার উত্তর মাথাটা সব সময় রয়েছে ধ্রুবনক্ষত্রের দিকে। কাজেই ধ্রুবতারা দেখে সহজেই উত্তরদিক ঠিক করা যায়। আগেকার দিনে জাহাজ ভাসিয়ে যারা পাড়ি দিত, দিক ভুল হয়ে গেলে তা ঠিক করে নেওয়ার তাদের একমাত্র উপায় ছিল ওই ধ্রুব।'

ঠাকুরমা বললেন, 'ধ্রুবর পাশেই একটু ছোট ছোট যে তারাগুলো—'

'ওগুলোর চারদিকে লাইন টেনে দিলে কতকটা একটা মাছের মতো দেখতে হয়, তাই ওর নাম হল ধ্রুবমৎস্য।'



ধ্রুবমৎস্য, কাশ্যপি ও ব্রহ্মহৃদয়

ঠাকুরমা বললেন, 'আমি কালপুরুষ চিনি।'

'আমিও চিনি।' বলে দেবু আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল কোন্ তারাগুলো মিলে কালপুরুষ হয়। সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে ধ্রুবতারার বিপরীত দিকে একজোটে কতকগুলো তারা রয়েছে, দেবু সেগুলো দেখিয়ে জানাল, 'সে হচ্ছে কাশ্যপি।'

ঠাকুরমা প্রশ্ন করলেন, 'ধ্রুবতারার ওদিকে ওই যে একটা মস্ত-বড় নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে ওটা কি?'

'ওর নাম ব্রহ্মহৃদয়।' দেবু বলল, 'এমনি কত সুন্দর সুন্দর

আর অদ্ভুত নামের নক্ষত্র আর নক্ষত্রের রাশি যে আকাশে আছে, সবগুলোর আমি নামও জানিনে। ক্রমে ক্রমে আমি সব চিনে নেব।' ... ...

রান্নাঘর থেকে মা ডেকে জানালেন যে রান্না হয়ে গেছে, দেবুর যদি পড়া হয়ে গিয়ে থাকে তো সে খেতে যেতে পারে।

ঠাকুরমাকে জ্ঞানদান এখানেই বন্ধ রেখে দেবু প্রায় ছুটেই রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। সেদিকে চেয়ে ঠাকুরমা স্নেহভরে হাসতে লাগলেন।